সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • মে-জুলাই ২০২৬

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

শিক্ষাচিন্তায় সবুজ পরিসর
শিক্ষালোক এক যুগ পূর্তি

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের বক্তৃতা

উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য করণীয়

শিক্ষালোক সম্মাননা ২০২৬

শিক্ষালোক সম্মাননা ২০২৬

সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম

সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন কবি সৈকত হাবিব

সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন পাঠাগার সংগঠক আবদুস ছাত্তার খান

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

শিক্ষালোক

মে - জুলাই ২০২৬ ● ১৩শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

সূচি

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের বক্তৃতা
উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য করণীয় ২

মনীষী আবুল কাসেম ফজলুল হক - আলমগীর খান ৫

আমার শিক্ষক আবুল কাসেম ফজলুল হক
- মাহফুজ সালাম ৭

৮ম শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন ও
শিক্ষালোক সম্মাননা-২০২৬ ৯

শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ায় পরিবর্তন প্রয়োজন
- আলাউল হোসেন ১৪

ক্যাডেট শফিউল স্মৃতি পাঠাগার উদ্বোধন
- মনিরুল ইসলাম শ্রাবণ ১৯

বৃক্ষপ্রেমী এক প্রতিবেশী - শিউলী আক্তার ২২

সেলিনা আক্তারের পাশে সিদীপ - হাবিবুর রহমান ২৩

কৃষক আব্দুল হালিম ও সেলিনা বেগমের
সফলতার গল্প - সঞ্জীব মন্ডল ২৪

জীবনযুদ্ধে সফল একজন কৃষাণী ও মা
- মো. ফয়সাল হোসেন ২৫

সাক্ষাৎকার: অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক ৩০

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

প্রচ্ছদ শিল্পী
আদনান অভি

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি

সম্পাদকীয়

শিক্ষালোকের এক যুগ পূর্তি। ২০১৪ সালের জুন মাসে অনেক আশা ও কিছু শঙ্কা নিয়ে শুরু হয়েছিলো সিদীপের এই ব্যতিক্রমী শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন। আশারই জয় হয়েছে। প্রথম থেকেই শিক্ষালোক সংস্থার ভিতরে ও বাহিরে শিক্ষানুরাগী মহলে প্রীতির আসন লাভ করে। তারপর এক যুগের যাত্রাপথে সমচিন্তার সম্পর্কসূত্রে গড়ে উঠেছে বলতে গেলে এক শিক্ষালোক পরিবার যার পরিসর বাড়ছে উত্তরোত্তর। পরিবারের সকলকে নিয়ে আমরা প্রায়ই নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি। শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন তেমনই একটি নিয়মিত আয়োজন। এক যুগ পূর্তিতে বিশেষভাবে মনে পড়ে শিক্ষালোকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়াকে যিনি থাকতেন এসব অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হয়ে। যার আগ্রহ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া আমরা যাত্রাটা শুরুই করতে পারতাম না।

আমাদের যাত্রাপথে এবার প্রথমবারের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি যেখানে শিক্ষায়, সাহিত্যে ও পাঠাগার সংগঠনে বিশেষ অবদান রাখার জন্য দেশের ৩ জন গুণী ব্যক্তিকে শিক্ষালোক সম্মাননা-২০২৬ প্রদান করা হয়। এটিই আমাদের চলতি সংখ্যার মূল বিষয়। ১৯ জুন এই শিক্ষালোক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। এর দুই সপ্তাহ পরই ৫ জুলাই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে হঠাৎ চিরবিদায় নেন তিনি। শিক্ষালোকের বিভিন্ন আয়োজনে তিনি উদারভাবে সম্মতি দিয়ে উপস্থিত হতেন। সেজন্য এ মহান মানুষটির সঙ্গে শিক্ষালোক পরিবারের এক স্মৃতিময় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক আমাদের জাতিকে তাঁর লেখা, আদর্শ, চিন্তাচেতনা দিয়ে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি ছিলেন জাতির বিবেকস্বরূপ। শুভবুদ্ধিময় নৈতিকতার ধারক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক মানুষের মনে বেঁচে থাকবেন জাতীয় জীবনের একজন পথনির্দেশক হয়ে।

শিক্ষালোক সম্মাননার পাশাপাশি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে এ সংখ্যায় তাঁর উপর বিশেষ আলোকপাত করা হলো।

গত বছর ১৬ জুলাই আমরা হারিয়েছি সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভূঁইয়াকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি তাঁকেও।

তাছাড়া আমাদের নিয়মিত কিছু বিষয় থাকলো এ সংখ্যায়।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস
বাড়ী নং- ২২/৯, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

শিক্ষা বিষয়ে
অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের
সর্বশেষ বক্তৃতা

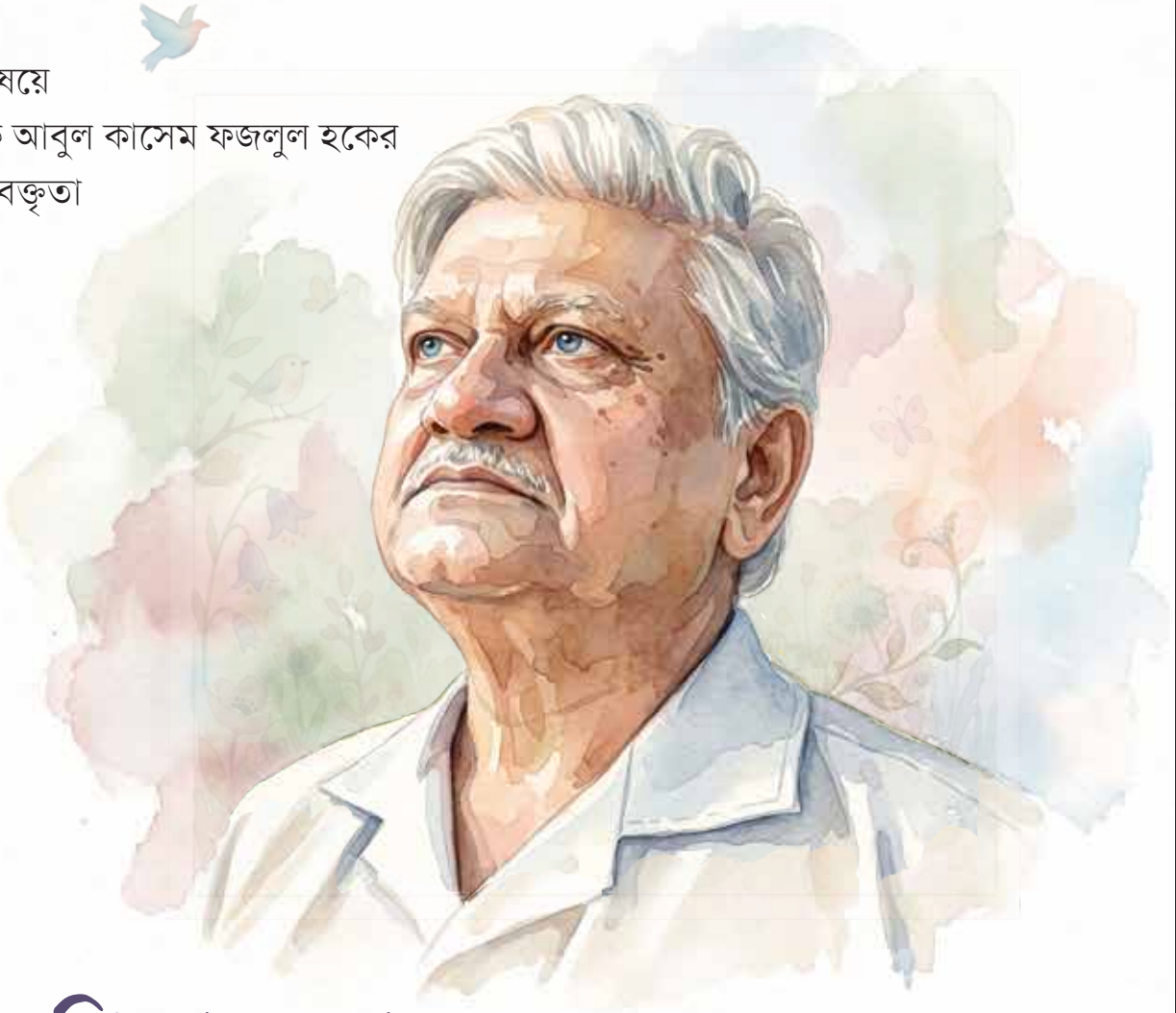

উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য করণীয়

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ - ৫ জুলাই ২০২৬

[১৯ জুন ঢাকার শ্যামলীতে সিদীপ মিলনায়তনে '৮-ম শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন ও শিক্ষালোক সম্মাননা-২০২৬' শীর্ষক দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি প্রদান করেন। রেকর্ডকৃত বক্তব্যটি পাঠের সুবিধার্থে পুনরাবৃত্তি পরিমার্জন করে লিখিত।]

আমি শিক্ষা নিয়ে আলোচনাটা একটু গোড়ার দিক থেকেই শুরু করতে চাইছি। শুরুটা করা যায় ১৯৪৭ সালের দেশভাগ থেকে। প্রথমে পাকিস্তান হলো, তারপরে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হলো। লক্ষ্যণীয় যে, এই যাত্রার প্রত্যেকটি পর্যায়েই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে। আমরা যদি ৪৭-এর আগেও যাই, ব্রিটিশ আমলে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, এ. কে. ফজলুল হক– তারা ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তারা বলতেন, ব্রিটিশ শাসকরা যে শিক্ষা আমাদের দিচ্ছে, তাতে আমাদের ওপর তাদের কর্তৃত্ব বহাল রাখার উদ্দেশ্যকেই মূল করে আমাদের শিক্ষার কিছু সুযোগ দিচ্ছে। এই শিক্ষা পরিবর্তন করতে হবে; শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষাব্যবস্থা, সবটাই। এই কথাগুলো খুব জোরেশোরেই তারা বলেছিলেন।

পরবর্তীতে পাকিস্তান হওয়ার পরে শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করে নবায়িত করার কথা খুব বড় করে এসেছে। কিন্তু বাস্তবে

দেখা গেলো ইংরেজরা যতই খারাপ হোক, তারা আমাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটাকে ততোটা খারাপ রাখেনি; অনেকখানি শিক্ষার সুযোগ আমাদেরকে দিয়েছে। তারা আমাদের ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দিতে চেয়েছে। যদিও সেটাতে তাদের সাম্রাজ্যবাদী ইচ্ছা ছিলো। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজের উচ্চশ্রেণির অনেক মানুষ ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে ইংরেজি ভাষাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন।

কিন্তু তারপরেও যদি আমরা এই প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক এবং আরও উচ্চ পর্যায়ে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ শাসকরা খুব বেশি কার্পণ্য করেনি। শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে এই দেশের মানুষ উন্নত হোক এটা অনেকটাই তারা চেয়েছে। কাজেই ব্রিটিশ শাসনামলের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আমরা যারা কঠোর সমালোচনা করেছি, সেই সমালোচনাতে অত্যুক্তি ছিলো।

আমাদের বাস্তব অবস্থান বিবেচনা করলে, এখন সামনের দিকে এগুতে হলে ব্রিটিশ শাসকেরা যে ব্যবস্থা ও যে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করে গিয়েছিল, সেটা একেবারে উল্টে দেব, পাল্টে দেব– এই চিন্তা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে। বরং, ওটা রক্ষা করে আমাদের পরিবর্তনগুলো করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনের দিকে যেতে হবে। সেই সাথে আমাদের যে স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতাকে আমাদের অর্থবহ করতে হবে। স্বাধীনতার মনোভাব, তার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষা, সমস্তকিছুর মধ্যে স্বাধীনতার মূল্যবোধ, স্বাধীন চিন্তাচেতনা, স্বাধীন রাষ্ট্রে নাগরিকদের আত্মমর্যাদাবোধ– এসব বিকশিত করতে হবে।

তবে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনে আমি গুরুত্ব দিতে চাই শিক্ষাব্যবস্থার ভিতরে যারা আছেন তাদের ওপর। আমি মনে করি, তাদের চিন্তাভাবনা নবায়িত করা দরকার। আমি জানি, ব্যাপারগুলো পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কঠিন মানে এই নয় যে, অসম্ভব। এই কঠিনতা যে শুধু আমাদের দেশে, আমাদের জাতির মধ্যে, তা নয়; এটা প্রাচ্য বলি, পাশ্চাত্য বলি– সব জাতির মধ্যেই এগুলো কঠিন। কিন্তু সেই কঠিন সমস্যা সমাধান করে করেই তো মানবজাতি এবং বিভিন্ন জাতি উন্নতি করেছে।

আমাদেরকেও সেই কঠিন সমস্যা অতিক্রম করে চলতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষানীতি ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথাই বলা যায়। তবে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, তা হলো– মানুষের স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের জানবার, বুঝবার আরও বেশি প্রয়োজন আছে।

মানুষের কিছু স্বাভাবিক প্রবণতা আমরা সমাজ ও রাজনীতির নানা ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। যেমন, ধরুন একটি এলাকায় একজন জাতীয় সংসদ সদস্য, একজন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বা অন্য কোনো জনপ্রতিনিধি আছেন। তারা কি সত্যিই চান যে নতুন আরেকজন মানুষ উঠে আসুক, জনপ্রিয় হয়ে তাদের পরাজিত করুক এবং তাদের জায়গা দখল করুক? বাস্তবে সাধারণত তা দেখা যায় না। মুখে সবাই সুষ্ঠ নির্বাচন ও নতুন নেতৃত্বের কথা বললেও সবার মনোভাব ইতিবাচক থাকে না। যে ব্যক্তি যেখানে কর্তৃত্বে আছেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই সেই কর্তৃত্ব ধরে রাখতে চান। নতুন কেউ উঠে এসে তার অবস্থানকে দুর্বল করুক বা তার জায়গা নিয়ে নিক– এটি তিনি সহজে মেনে নিতে চান না।

এটি মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য, যা পৃথিবীর সর্বত্র কমবেশি দেখা যায়। কিন্তু যে জাতিগুলো নানাভাবে উন্নতি করেছে, তারা এই স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যেই নিজেদের আত্মসমালোচনা করার ক্ষমতা গড়ে তুলেছে। তারা সমালোচনাকে গ্রহণ করেছে, বিচার-বিবেচনার চর্চা করেছে এবং শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, সবার কল্যাণের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়েছে। এ কারণেই তারা উন্নতির পথে আরও এগিয়ে যেতে পেরেছে। অনেকটা যে উন্নতি করে ফেলেছে তা না, আমি বলবো কিছুটা পেরেছে। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ যা চান, তারা তাদের অবস্থান অটুট রেখে, কর্তৃত্ব ধরে রেখে সকলের উন্নতি করবেন। আমি বলব, এই বাস্তবতাকে অস্বীকার না করে বরং এর মধ্যেই কীভাবে সর্বজনের কল্যাণ নিশ্চিত করা যায় কীভাবে সবার উন্নয়নের পথ তৈরি করা যায়, তা নিয়েই আমাদের ভাবতে হবে। কিন্তু এইসব চিন্তাভাবনা তো আমাদের দেশে মোটেই বিকশিত হয়নি। যারা রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে লেখেন, তারা তো মানুষের মনের দিকটার দিকে একটুও নজর দেন না।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যতই আমরা চিন্তা করি, যারা সেই ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন, পরিবর্তন করবেন, উন্নত করবেন অথবা চালিয়ে নেবেন, তাদের নিজেদের সদিচ্ছা থাকতে হবে। অথচ তাদের এমন একটা মানসিকতা থাকে যে, নিজেদের সেই কর্তৃত্ব, নিজেদের সেই সুযোগ-সুবিধাটা রক্ষা করে শিক্ষাব্যবস্থাটাকে তারা অগ্রসর করতে চান। যতই স্যাক্রিফাইস করার কথা বলা হোক, সার্বজনীন কল্যাণের কথা বলা হোক, যে কমিটিগুলোর মাধ্যমে এসব প্রবর্তন করা হয়, সংসদে যারা এসব চিন্তা করে ঠিক করেন, তাদের মধ্যে নিজেদের কর্তৃত্বের, নিজেদের স্বার্থের একটা বোধবুদ্ধি কাজ করে। তারা মূলত নিজেদের স্বার্থচিন্তা বজায় রেখে সকলের কল্যাণের চিন্তা করেন।

আজকে যারা আওয়ামী লীগ করেন, বিএনপি করেন, জামায়াতে ইসলামী করেন, তাদের মধ্যে একটা স্বার্থগত

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, তাঁর বামে শিক্ষালোক সম্পাদক ফজলুল বারি ও শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম এবং ডানে কথাসাহিত্যিক আহমদ বশীর, উন্নয়নকর্মী মাসুদা বানু ফারুক রত্না ও পুষ্টিবিদ ফাহমিদা করিম

পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যটাই রাজনীতিতে নানাভাবে বিস্তৃত হয়। এই বাস্তবতা রাজনীতি ও মতাদর্শের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কোনো জাতি যখন উন্নয়নের পথ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার মডেল নির্বাচন করে, তখন শুধু তত্ত্ব নয়; নেতৃত্বের মানসিকতা, ইতিহাসবোধ এবং বাস্তবতাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও সেই সিদ্ধান্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

মার্কসবাদী চিন্তাধারার একটা অসাধারণ প্রভাব আছে গোটা পৃথিবীজুড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীন যখন বিপ্লব করে তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলালো, তখন গোটা পৃথিবীতে বিরাট আশা জেগেছিল যে, পৃথিবীর সর্বত্রই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গিয়ে প্রত্যেক জাতি এবং গোটা মানবজাতি অনেক উন্নতি করতে পারবে। এখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাওয়ার একেবারে সূত্রবদ্ধ কোনো ফর্মুলা নেই। প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আলাদা, অতীত আলাদা। নানাভাবে জাতিগুলো বিকশিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে এবং বর্তমান অবস্থায়ও এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির পার্থক্য আছে।

এই বাস্তবতার মধ্যে প্রত্যেক জাতিকে তার উন্নতির পথ নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের বুদ্ধিতে, নিজেদের সামর্থ্যের আলোকে নতুন করে নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, এই বিষয়টি সব জাতির মধ্যে সকলে সমানভাবে- বিশেষত যারা নেতৃত্ব দেন, তারা উপলব্ধি করতে পারেননি। আমাদের দেশে ব্যাপারটি এমন হলো যে, মস্কোতে যা হয়েছে, বাংলাদেশেও সেরকমই করতে হবে। অথবা চীনে যা হয়েছে, বাংলাদেশে সেরকমটাই করতে হবে। আমাদের যারা নেতা ছিলেন, তারা চীনপন্থী, রুশপন্থী বলে পরিচিত হলেন। কিন্তু ঢাকাপন্থী, বাংলাদেশপন্থী নয়। এই এলাকার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে আমাদের উঠতে হবে– এই চিন্তাটা প্রায় অনুপস্থিত থেকে গেছে।

আমি বলব, যখন কোনো ভালো দৃষ্টান্ত সামনে আসে, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে তো বটেই, যারা নেতৃত্ব দেন, তাদের মধ্যেও সেটা অনুকরণ করার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্তু যেসব দেশে এই অনুকরণপ্রবণতা অন্ধভাবে দেখা দিয়েছে, সেইসব জাতি বিপ্লবও করতে পারেনি, উন্নতিও করতে পারেনি; গতানুগতিক ধারাতেই একরকম চলেছে। আর যেসব জাতি এই ব্যাপারটা বুঝেছে এবং নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য অবলম্বন করে বাইরের জগতের বা অন্য জায়গা থেকে পাওয়া ভালো কিছু গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছে, তারা সাফল্যের সঙ্গে পরিবর্তন করতে পেরেছে। সাফল্য বলতে শতভাগ সাফল্য নয়; কিছুটা সাফল্য বা অনেকটা সাফল্য– এইরকম। কোনো সাফল্যই কি শতভাগ হয়? যাইহোক, আমরা শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করছি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করছি। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এগুলো আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

এই বিষয়গুলা বুঝলে আমরা যখন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কথাবার্তা বলব, তখন আমাদের ভাষা, বক্তব্য মার্জিত হবে। মনে রাখতে হবে, অনেক অন্যায় শুধুমাত্র সংগ্রাম করলেই দূর করা যাবে না। দূর করতে হলে ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তাহলে পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলো উন্নত হতে হতে একটা উন্নত অবস্থায় পৌঁছাবে। যাই হোক, আমরা এসব ব্যাপার নিয়ে যদি আরও চিন্তা করি, বিচার-বিবেচনা করি, তর্ক করি এবং ভুল থেকে শুদ্ধতার দিকে যেতে চাই, তবে অবশ্যই আমরা পারবো। আমাদের দেশেও উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

শুভবুদ্ধিময় নৈতিকতার প্রতীক মনীষী আবুল কাসেম ফজলুল হক

আলমগীর খান

আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর শিক্ষকতা ও লেখালেখির জীবনে বাংলাদেশে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন ব্যক্তিত্ব। সবসময় একজন অহিংস, নির্লোভ, সমাজদরদী, অন্যের প্রতি সহমর্মী ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করেছেন তিনি। আর চিরতরুণের মত বুকে পুষেছেন সমাজ পরিবর্তনের আপসহীন স্বপ্ন। তাঁর সমস্ত সাহিত্য সাধনা এই এক উদ্দেশ্যেই নিবেদিত ছিলো। দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি তাঁকে সবসময় পীড়িত করেছে, তবে কখনো হতাশ করেনি। এক সুন্দর সংস্কৃতিবান যুক্তিবোধসম্পন্ন নৈতিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন আমৃত্যু তাঁকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। আর এই স্বপ্ন পূরণে তিনি অনেক বেশি ভরসা করতেন তরুণ সমাজের উপর।

স্যার যখন অপরাজেয় বাংলার উল্টো দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কোয়ার্টারে থাকতেন তাঁর বাসায় প্রায়ই যেতাম। দীর্ঘসময় ধরে তিনি নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতেন, কেন্দ্রীয় বিষয় অবশ্য হতো রাজনীতি ও সমাজের গতিপ্রকৃতি এবং দেশের ভবিষ্যৎ। কারো সম্পর্কে বিদ্বেষ ও বিষোদগার কখনই প্রকাশ পেত না। তবে কবিলেখকদের সমালোচনা করতেন, সবচেয়ে বেশি আক্ষেপ করতেন ভালো মানের লেখার অভাব নিয়ে। যেসব লেখক আমাদের দেশে খ্যাতিমান ও আমরা যাদের অনেকের প্রতি মোহগ্রস্ত তাদের অনেকের ব্যাপারে তাঁর কণ্ঠে হতাশা প্রকাশ পেত। যাদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন তারা সত্যিকার অর্থেই আমাদের সাহিত্যের খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখক, এমনকি কম আলোচিত হলেও।

তিনি যেমন ছিলেন অনেকের প্রতি উদাসীন, তেমনি কারো কারো প্রতি ছিলেন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। নব্বইয়ের দশকে রশীদ করিমের উপন্যাস আমাকে অনেক বেশি আচ্ছন্ন করেছিলো। স্যারকে একদিন কথাটা বলতেই তিনি বললেন, "তুমি রশীদ করিমকে নিয়ে একটা লেখা লিখো।" সবাই জানেন, স্যারের সম্পাদনায় তখন 'লোকায়ত' নামে একটি উঁচু মানের সাহিত্য পত্রিকা বের হতো। বললেন, "তুমি লেখো, আমি লোকায়তে ছাপবো।" বললাম, "স্যার কত বড় হতে পারে লেখাটা।" বললেন, "কোনো সমস্যা নেই, যত বড় হয় হবে। প্রয়োজনে আমি কেবল রশীদ করিমকে নিয়ে তোমার একটা লেখা দিয়েই একটা সংখ্যা ছাপবো।" তবে এ দায়িত্বটা পালনের মত সক্ষমতা তখন আমার ছিলো

না, ফলে আর লেখা হয়ে ওঠে নাই। কথাটা উল্লেখ করছি, স্যারের সাহিত্য সমালোচনা ও প্রীতি সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার জন্য।

বাংলা সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে আবুল হুসেন ও কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম। প্রায়ই তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখা গোষ্ঠীর কাজের উল্লেখ করতেন। বহু বছর পর এ বছরের ২০ জুন, অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পনের দিন পূর্বে, এ বিষয়ক একটি আলোচনাতেই স্যারের সঙ্গে আমার ও আমাদের ছোটকাগজ 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি'র সদস্যদের সঙ্গে সর্বশেষ দেখা। 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি'র উদ্যোগে ওই দিন বিকালে রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে লেখক মোহাম্মদ শামছুজ্জামান রচিত জীবনধর্মী উপন্যাস 'নিষুপ্ত জাগরণ'-এর প্রেক্ষাপট ও সমকালীন মূল্যায়ন শীর্ষক একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপন্যাসটি মুসলিম সাহিত্য সমাজের 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের প্রধান সংগঠক আবুল হুসেন-এর জীবন ও আদর্শের ওপর ভিত্তি করে রচিত। উল্লেখ্য, উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ছেলে দীপনের প্রকাশনী জাগৃতি থেকে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেন, "১৯২৬ সালে মুসলিম

সাহিত্য সমাজ ও শিখা গোষ্ঠী আন্তরিকতা নিয়ে প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে সত্য নির্মাণের জন্য চেষ্টা করতেন। প্রবীণরা এদের বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু নবীনদের মনোভাব ছিলো তারা তাদের কথা বলুক। সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে কোথায় কতটা কমপ্রোমাইজ করতে হবে তা তারা জানতেন।"

আবার ঠিক আগের দিনই অর্থাৎ ১৯ জুন আরেকটি অনুষ্ঠানেও তাঁর উপস্থিতি অম্লান স্মৃতি হয়ে আছে ও থাকবে। ঢাকার শ্যামলীতে ওই অনুষ্ঠানটি ছিলো ৮ম শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন উপলক্ষে। যেখানে শিক্ষালোক সম্মাননা-২০২৬ প্রদান করা হয় শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম, কবি সৈকত হাবিব ও পাঠাগার সংগঠক আবদুস ছাত্তার খানকে। আবুল কাসেম ফজলুল হক স্যার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মাননা স্বরূপ উক্ত তিনজন গুণী ব্যক্তির হাতে পদক তুলে দেন। ওই অনুষ্ঠানে তিনি শিক্ষা সম্পর্কে খুব সুচিন্তিত একটি মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। যার পুরোটা ভিডিও রেকর্ডকৃত।

২০ জুনের আলোচনা অনুষ্ঠানে স্যার বলেছিলেন, "বাংলাদেশ বিনির্মাণে তিনজনের অবদান আছে, শেরে-বাংলা, ভাসানী ও শেখ মুজিবের।" এছাড়াও বলেন, "কোন জাতির উন্নতির জন্য রাষ্ট্রকে সার্বজনীন করতে হয়। নানা জাতি গোষ্ঠী নিয়েই রাষ্ট্র হবে। সমাজে ধনী-গরিব আছে, এটা থাকবে তবে এটা কমিয়ে আনার আয়োজন দরকার। সমাজে অন্যায় অবিচার থাকে, তবে ন্যায় চর্চা করতে হবে।" শিখা গোষ্ঠী সম্পর্কে তিনি বলেন, "তারা একসাথে কাজ করেছেন। তারা সংখ্যায় কম ছিলেন, কিন্তু ছিলেন শক্তিমান।"

তাঁর লেখালেখি ও চিন্তায় নীতিনৈতিকতার প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থিত। 'নিষুপ্ত জাগরণ' বই নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানেও তিনি বলেন, আমাদের রাজনীতিতে সৎ নেতৃত্ব দরকার। এই ন্যায় চর্চার ও সৎ নেতৃত্বের কথা তিনি আগেও বহুবার উচ্চারণ করেছেন। আসলে আবুল কাসেম ফজলুল হকের লেখাসমূহের একটি অন্তর্লীন বক্তব্য হচ্ছে নৈতিকতা। আমাদের দেশের বর্তমান লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এটি তাঁর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আমরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে গত বছর অক্টোবরে নৈতিক দর্শন বিষয়ে 'নী' নামে একটা ছোটকাগজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করি। যেখানে আবুল কাসেম ফজলুল হকের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় নৈতিকতা বিষয়ে। সেখানে তিনি বলেছেন, "মানুষের আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে মানুষের নৈতিক উন্নতি সমান গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করা উচিত। নৈতিকতা নিয়ে পত্রপত্রিকাতে লেখায় আমার অনেক পরিচিতজনও আমাকে বলতেন, এটা নিয়ে আপনি কেন লিখছেন, এটা তো মোল্লা-মৌলভীদের ব্যাপার। আমি বলেছি–না, এটা কমিউনিস্টদেরও ব্যাপার, বামপন্থীদেরও ব্যাপার।" সাক্ষাৎকারটিতে তিনি আরও বলেন, "নৈতিক বিবেচনা এবং অর্থনৈতিক বিবেচনাকে এক সাথে ভাবতে হবে। সাইকোলোজিস্টরা মন নিয়ে কী বলেন। পারিপার্শ্বিকতা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে মানুষের মস্তিষ্কে যায়। এর মধ্য দিয়ে সে বিচার বিবেচনা করে। দুনিয়া বদলাচ্ছে। প্রকৃতি বদলাচ্ছে। মানুষের অভিজ্ঞতা বদলাচ্ছে। এর মধ্যে পরিবর্তনশীলতা দরকার। পরিবর্তনশীলতা প্রকৃতির নিয়মনীতির মধ্য দিয়ে করতে হবে। জরবদস্তি করে ভালো কিছু প্রতিষ্ঠা করা যায় না। মানুষের খাওয়াপরার পরই নৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন। নৈতিকতা একটা জীবনের ব্যাপার।"

নৈতিক দর্শন নিয়ে আবুল কাসেম ফজলুল হক কমবেশি ভাবনাচিন্তা করেছেন যা তাঁর বিভিন্ন লেখায় ও আলোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। এ বিষয় নিয়ে তাঁর আগ্রহ সমসাময়িক লেখক-বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে অনেক বেশি ছিলো। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, মাস দুয়েক আগে তিনি হঠাৎ ফোন করে বলছিলেন, "তোমাদের নৈতিক দর্শনের ছোটকাগজটা কিন্তু বন্ধ করো না। একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করেছো। খুবই প্রয়োজনীয়। পরের সংখ্যাটা প্রকাশের উদ্যোগ নাও।" বলেছিলাম, "বন্ধ করবো না, স্যার। অবশ্যই উদ্যোগ নিবো।"

তাঁর সাহিত্যবোধ ও মূল্যায়ন গতানুগতিক নয়, ছিলো ব্যতিক্রমী ও অর্থবহ। প্রচলিত, চর্বিতচর্বণ, সাময়িক বিনোদনমূলক সাহিত্যচর্চা তাঁকে আকর্ষণ করতো না। চাইতেন নতুন চিন্তার বিকাশ। ভালবাসতেন সাহিত্যে চিন্তাশীল সমালোচনা। নব্বইয়ের দশকে 'লোকায়ত' সাময়িকীতে নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে তীব্র সমালোচনা করে আমার একটা লেখা বের হয়েছিলো। স্যার বলেছিলেন, "তোমার লেখাটা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকের মাঝে প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তারা এটা পছন্দ করেনি। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, লেখাটা ভাল হয়েছে। সঠিক লিখেছো।"

মাঝে মাঝে স্যারের লেখারও সমালোচনা করেছি, ধৈর্য্য ধরে শুনেছেন। ধৈর্য্যের ক্ষেত্রে তিনি যে পর্বতসমান তার প্রমাণ দিয়েছেন পুত্র দীপনের মৃত্যুর পর। কারো কাছে বিচার প্রার্থনা না করে নিজে অটল থেকে কাঁপিয়েছিলেন দেশকে একটি ছোট্ট উক্তি দিয়ে: শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

শুভবুদ্ধির কি এখনো উদয় হয়েছে? কবে হবে কে জানে!

আমার শিক্ষক আবুল কাসেম ফজলুল হক

মাহফুজ সালাম

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের বামে লেখক ও ডানে অধ্যক্ষ পাভেল চৌধুরী

আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান এবং গর্বিত মনে করি এই কারণে যে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একজন ছাত্র ছিলাম। ১৯৮১-১৯৮২ সেশনে এমএ-র শেষ বর্ষের ছাত্র। এই গর্বের পেছনে আরও একটা বড় কারণ ছিল, আমি যাদের ছাত্র ছিলাম তারা প্রত্যেকেই ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একেকজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। প্রিয় শিক্ষকদের মধ্যে জীবিত অবস্থায় শেষ পর্যন্ত যাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি তিনি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক স্যার। কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ঢাকার বাইরে থাকায় তাঁর সাথে নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হতো না। তবে ২০১০ সালে ঢাকায় ফিরে আসার পর বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমরা কয়েকজন মিলে স্যারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'লোকায়ত' সাহিত্যপত্রিকা সংগ্রহ করতাম এবং বিভিন্ন লেখা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতাম।

স্যার ছিলেন অত্যন্ত সৎ, নিষ্ঠাবান ও নিরহংকারী মানুষ। ছাত্রদের তিনি কেবল পাঠ দানই করতেন না, তাদের জীবন নিয়েও ভাবতেন। দেশের অবস্থা, সমাজের অবস্থা আমাদের কী হবে, পড়াশোনা শেষে কী করব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে স্যারের সাথে কখনও কখনও আলাপ হতো। সমাজ ও দেশের বর্তমান পরিবর্তন, মানুষের দায়িত্ব– এসব বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন। ক্লাস শেষে আমরা কয়েকজন তাঁর কক্ষে গিয়ে বসতাম কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে দীর্ঘ সময় আলোচনা করতাম।

১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের স্মরণীয় আলাপ হয়। তখন এমএ-র দুই-তিনটা পরীক্ষা বাকী। এরই মধ্যে বাংলাদেশ পল্লীউন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর একটি প্রকল্পে আমার চাকরি হয়ে যায়। কর্মস্থল ময়মনসিংহ সদর। সেখানে যোগদান করব কী না এ নিয়ে একটু দ্বিধায় ছিলাম। এক বিকেলে সূর্যসেন হলের সামনে স্যারের সাথে হাঁটতে হাঁটতে বিষয়টি জানালাম, তিনি মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। তার পর বললেন "দেখো তোমরা মফস্বলের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। জীবনে বাস্তবতার সঙ্গে আপস করেই এগোতে হয়। দেশের বর্তমান যা অবস্থা, ভালো

একটা চাকরি পাওয়া সহজ নয়। যদি পড়ালেখা শেষ হওয়ার আগেই চাকরি পাও তবে সেটি ভাগ্যের বিষয়।"

আমি বললাম পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। স্যার মৃদু হেসে বললেন "পরীক্ষার আগের দিন ময়মনসিংহ থেকে ট্রেনে ঢাকায় চলে আসবে, পরীক্ষা দিয়ে আবার কর্মস্থলে ফিরে যাবে। এমন উদাহরণ অনেক আছে। দ্বিধা না করে যোগদান কর।"

আজও মনে হয় একজন প্রকৃত শিক্ষক কেবল পাঠ্যবই শেখান না, জীবনের পথও দেখিয়ে দেন। দীর্ঘ কর্মজীবনের পাশাপাশি আমি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত থাকি। দীর্ঘদিন বাইরে থেকে ঢাকায় আসার পর শিক্ষালোক বুলেটিনে নিয়মিত লিখছি। শিক্ষালোক বছরে একটি দিন কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি মিলনমেলার আয়োজন করে। সেখানে প্রায়ই প্রধান অতিথি বা আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক স্যার। আসেন দেশের অনেক বরেণ্য কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীগণ। এরই মধ্যে ২০২৫ সালের একুশে বই মেলায় আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চোখের জল জলের চোখ' প্রকাশিত হয়।

মনে মনে ইচ্ছা ছিল স্যরের হাতে বইটি তুলে দেব। এরপর শিক্ষালোক আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে স্যারকে সালাম দিয়ে তাঁর হাতে আমার কবিতার বইটি তুলে দিলাম। বইটা উল্টেপাল্টে দেখলেন এবং স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন 'ভাল'। 'লিখে যাও'। তাঁর এই দুটি শব্দ সবসময় আমার লেখালেখির প্রেরণা হয়ে থাকবে।

এরপর ২০ জুন ২০২৬-এ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' সংগঠনের উদ্যোগে মুসলিম সাহিত্য সমাজের 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের প্রধান সংগঠক আবুল হুসেন-এর জীবনধর্মী উপন্যাস নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান, সেখানেও স্যার প্রধান অতিথি। মোহাম্মদ শামসুজ্জামান রচিত 'নিষুপ্ত জাগরণ' উপন্যাস নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে আমি 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি'র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে সভাপতির দায়িত্ব পালন করি।

একজন ছাত্র হিসেবে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে প্রধান অতিথি হিসেবে পাশে বসিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করা আমার জীবনে এক গৌরবময় মুহূর্ত। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন ও স্মৃতি, পরিবারের খোঁজখবর ও ব্যক্তিগত নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হয়। তিনি আগের মতই সব শুনছিলেন, সন্তানদের খবর নিলেন, লেখালেখির খোঁজ নিলেন। অনুষ্ঠান চলাকালেই আরেকটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে বার বার ফোন আসছিল। মৃদু হাসি দিয়ে তিনি বললেন 'এই বয়সে আর কত? কিন্তু না গেলে মানুষ কষ্ট পায় তাই দুই চারটে কথা বলতে যেতেই হয়।' আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করার আগেই তিনি বক্তব্য প্রদান করে অন্য অনুষ্ঠানে চলে যান। সেটিই ছিল স্যারের সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

সে দিনের বক্তব্যে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলো আজও আমার কানে বাজে। তিনি বলেছিলেন, "জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা ছাড়া জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়, সমাজ কখনো একেবারে অন্যায়মুক্ত হবে না, কিন্তু অন্যায় কমিয়ে আনতে হলে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।"

শিশুদের প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের শিশুরা যেন স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে। পরিবার থেকেই মুক্তবুদ্ধির চর্চা শুরু হওয়া উচিত। অন্ধবিশ্বাস সম্পর্কে তিনি বলেন, কোন কথা কেবল শুনেই বিশ্বাস করা উচিত নয়; যুক্তি, জ্ঞান ও সত্যের আলোয় তা যাচাই করতে হবে। বিজ্ঞান মানুষের প্রশ্ন করার ক্ষমতা বাড়িয়েছে, আর প্রশ্ন করার মধ্য দিয়েই সত্যের অনুসন্ধান সম্ভব'।

তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও 'শিখা' আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ১৯২৬ সালে একদল সাহসী মানুষ প্রচলিত অন্ধকার ভেদ করে মুক্তবুদ্ধির চর্চার সূচনা করেছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় কম ছিলেন, কিন্তু আদর্শে দৃঢ় ছিলেন। ঐক্য, সততা ও সত্যের প্রতি অঙ্গীকারই তাঁদের শক্তি ছিল। সমাজ পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্ব, মুক্তচিন্তা এবং জ্ঞানচর্চার বিকল্প নেই– এই বিশ্বাস তিনি আজীবন ধারণ করেছিলেন। এই ছিল তাঁর বক্তব্য। কে জানত অল্প কিছুদিন পরই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন!

২০২৬ সালে ৫ জুলাই অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক স্যার পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যু শুধু তাঁর পরিবার বা ছাত্রদের নয়, সমগ্র জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক, গবেষক, চিন্তাবিদ এবং সর্বোপরি একজন আলোকিত মানুষ। তাঁর জীবন আমাদের শিখিয়েছে- জ্ঞানচর্চা, সততা, মানবিকতা ও মুক্তচিন্তার কোন বিকল্প নাই।

আজও যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, সূর্যসেন হলের সামনের সেই বিকেল, তাঁর আন্তরিক পরামর্শ, তাঁর স্নেহময় কণ্ঠ এবং শেষ সাক্ষাৎকারের স্মৃতিগুলো হৃদয়ে অনুরণিত হয়। একজন ছাত্র হিসেবে এ আমার অমূল্য প্রাপ্তি। শ্রদ্ধেয় স্যারের স্মৃতি আমাদের পথ দেখা, তাঁর আদর্শ নতুন প্রজন্মকে আলোকিত করুক। মহান আল্লাহ তাঁর আত্মাকে শান্তি দান করুন- এই প্রার্থনা করি।

৮ম শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন ও শিক্ষালোক সম্মাননা-২০২৬

আষাঢ়ের মেঘমেদুর এক বিকেলে শ্যামলীর সিদীপ প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠেছিল শব্দ, চিন্তা আর সৃজনের অপূর্ব মেলবন্ধনে। উপলক্ষ ছিল শিক্ষালোকের ৮ম লেখক-শিল্পী সম্মিলন ও শিক্ষালোক সম্মাননা প্রদান। আর তাতেই বিশেষ হয়ে ওঠে বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাস করা সংকট। আলোচনায় মূর্ত হয় অন্ধকার থেকে মুক্তির উপায়।

সমাজ, শিক্ষা আর সংস্কৃতির মর্মমূল স্পর্শ করার এক গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক ডেটাও উঠে আসে সেমিনারে-আলোচনায়। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিদীপের (সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস) শিক্ষা বিষয়ক ত্রৈমাসিক বুলেটিন 'শিক্ষালোক'-এর লেখক-শিল্পী সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণি পেশার বিশিষ্টজনেরা। যেখানে শিক্ষায় অনন্য অবদানের জন্য প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম, সাহিত্যে গভীর নিমজ্জনের জন্য কবি, প্রকাশক ও প্রাবন্ধিক সৈকত হাবিব এবং তৃণমূলে আলো ছড়ানো সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলনের সভাপতি, অনন্য পাঠাগার সংগঠক আবদুস ছাত্তার খানকে মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়।

তিন ব্যক্তিত্বের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়ার মুহূর্তটি ছিল যেন আলোর কারিগরদের প্রতি পুরো সমাজের এক বিনম্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ বিনির্মাণের তিন দিকপালকে এ সম্মাননা অর্পণ করা হয়।

১৯ জুন আয়োজিত এই সুধী সমাবেশটি শেষ পর্যন্ত আর কেবল আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা রূপ নিয়েছিল সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার সংকট, উত্তরণ এবং সৃজনশীল সমাজ বিনির্মাণের এক প্রাজ্ঞ সংলাপে। মেধা ও মননের এই অনন্য উৎসবে যেমন ছিল আত্মসমীক্ষার সুর, তেমনই ছিল গুণীজনদের কাজের যোগ্য স্বীকৃতি প্রদানের আনন্দঘন মুহূর্ত।

অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য ও তাৎপর্য বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের উপস্থিতি। সম্মিলনের মূল পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন বাংলা একাডেমির সভাপতি, প্রাজ্ঞ অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। বিশেষ অতিথির কথামালায় মুগ্ধতা ছড়ান প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আহমদ বশীর। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষালোকের সুযোগ্য সম্পাদক ফজলুল বারি এবং অত্যন্ত সুনিপুণ ও প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় পুরো আয়োজনটিকে একসূত্রে গেঁথে রাখেন এর নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান।

অনুষ্ঠানে সিদীপের নির্বাহী পরিচালক ও শিক্ষালোকের প্রধান সম্পাদক মিফতা নাঈম হুদার চিন্তাশীল নির্দেশনা ও মূল্যবান বক্তব্য উপস্থিত সুধীজনকে অনুপ্রাণিত করে। এক যুগের এই পথচলাকে স্মরণ করে তিনি তাঁর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার এবং সমাজকে চিন্তার খোরাক জোগানোর এই মহতি উদ্যোগ আগামী দিনে আরও বড় পরিসরে অব্যাহত থাকবে।

সম্মিলনের প্রথমার্ধ ছিল এক গভীর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক আলোচনার চারণভূমি। সকালের অধিবেশনে আয়োজিত 'শিশুর শিক্ষা অধিকার: নীতি, শিক্ষা প্রশাসন ও অভিভাবকত্ব' শীর্ষক বিশেষ 'শিক্ষালোক বক্তৃতা'য় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) খণ্ডকালীন শিক্ষক এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক খান মো. রবিউল আলম। তাঁর বক্তব্যে সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার এক অত্যন্ত সংবেদনশীল ও জলজ্যান্ত সংকট উন্মোচিত হয়। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভ ও আক্ষেপের সাথে তুলে ধরেন যে, আমাদের বর্তমান শিক্ষাকাঠামো দিন দিন তার আত্মিক ও সামাজিক চরিত্র হারিয়ে ফেলছে।

যে শিক্ষাব্যবস্থা একসময় গড়ে উঠত সমাজ, পরিবার আর স্থানীয় মানুষের যৌথ মেলবন্ধনে, আজ সেখানে স্থান করে নিয়েছে চরম আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ। প্রাচীন ও ঐতিহ্যগত সামাজিক সম্পৃক্ততা বা 'কমিউনিটি অংশগ্রহণ' কমে যাওয়ার ফলে বিদ্যালয়গুলো আজ সমাজবিচ্ছিন্ন একেকটি দ্বীপে পরিণত হচ্ছে। আমলাতন্ত্রের এই অতিরিক্ত শাসন ও যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য–যা হলো শিশুর স্বাধীন মনন ও সৃজনশীলতার বিকাশ–তা চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

শিক্ষার গুণগত মান নিম্নমুখী হওয়ার পেছনে এই প্রশাসনিক জটিলতা ও নিয়ন্ত্রণকামী মনোভাব অনেকাংশে দায়ী। তিনি আরও উল্লেখ করেন, শিক্ষা নীতি কেবল কাগজে-কলমে আদর্শবাদী হলে চলবে না, তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অভিভাবক ও সমাজের সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বরকে প্রাধান্য দিতে হবে। অভিভাবকত্ব আজ কেবল সন্তানের পরীক্ষার খাতার জিপিএ গোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, যা শিশুর মানসিক বিকাশকে আরও সংকীর্ণ করে তুলছে। আমলাতান্ত্রিক

শৃঙ্খল থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করে যদি পুনরায় সামাজিকীকরণ না করা যায়, তবে আগামীর প্রজন্ম কেবল সনদের আলোয় আলোকিত হবে, মানবিক বোধের আলোয় নয়।

খান মো. রবিউল আলমের এই গভীর ও সময়োপযোগী বিশ্লেষণের সূত্র ধরে প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক এক দীর্ঘমেয়াদি ও সুদূরপ্রসারী দর্শনের অবতারণা করেন। ঔপনিবেশিক আমলের উত্তরাধিকার বহনকারী আমাদের চলমান শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ব্রিটিশ আমলে যে কেরানি তৈরির উদ্দেশ্যে শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়েছিল, তা থেকে আমরা আজও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি। তবে এই রূপান্তর রাতারাতি বা কোনো জাদুমন্ত্রে ঘটিয়ে ফেলা সম্ভব নয়।

শিক্ষাব্যবস্থার মতো একটি বিশাল ও সংবেদনশীল কাঠামোর পরিবর্তন অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে করতে হয়। হুট করে চাপিয়ে দেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত হিতে বিপরীত হতে পারে। আমাদের লক্ষ্য হতে হবে এই শিক্ষাকে কীভাবে বিশ্বমানের করে তোলা যায়, যেখানে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতা এবং বাঙালি সংস্কৃতির চিরন্তন মূলবোধের চমৎকার সমন্বয় ঘটবে। এই বিশ্বমানের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র, সরকার ও নীতিনির্ধারকদের অত্যন্ত দূরদর্শী ও যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং শিক্ষাবিদদের স্বাধীন মতামতের ওপর ভিত্তি করে যদি নীতি নির্ধারিত হয়, তবেই শিক্ষার এই ক্রান্তিকাল উত্তরণ সম্ভব। অধ্যাপক ফজলুল হকের এই প্রাজ্ঞ বক্তব্য উপস্থিত শ্রোতাকূলকে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে যে, শিক্ষার সংকট নিরসনে আমাদের আরও কতটা ধৈর্যশীল এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

সম্মিলনের দ্বিতীয় পর্বটি ছিল আবেগ, স্বীকৃতি আর নতুন করে পথ চলার শপথের। 'শিক্ষালোক সম্মাননা-২০২৬' প্রাপ্তির পর গুণীজনদের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত বিনম্র ও হৃদয়স্পর্শী। শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, একজন শিক্ষাব্রতীর কাছে সমাজের তরফ থেকে পাওয়া যেকোনো স্বীকৃতিই আনন্দের, তবে শিক্ষালোকের এই সম্মাননা আমার হৃদয়ে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এর কারণ, তাদের এই পুরো উদ্যোগের পেছনে কোনো কৃত্রিম জাঁকজমক নেই, যা আছে তা হলো এক নিবিড় ও আন্তরিক ভালোবাসা। এই ভালোবাসাই একজন কাজ পাগল মানুষকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আলো ছড়িয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়।

সাহিত্যে অবদানের জন্য সম্মানিত কবি ও প্রাবন্ধিক সৈকত হাবিব শিক্ষালোকের এই দীর্ঘ এক যুগের যাত্রাকে সাধুবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, আজকের এই ভোগবাদী সমাজে যেখানে সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চাকে প্রান্তিক করে রাখা হচ্ছে, সেখানে একটি ত্রৈমাসিক বুলেটিনের লম্বা সময় ধরে টিকে থাকা এবং সাহিত্যের মানুষদের এভাবে মূল্যায়ন করা সত্যিই এক পরম বিস্ময় ও আশার আলো।

পাঠাগার আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব আবদুস ছাত্তার খান তাঁর বক্তব্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বইয়ের আলো পৌঁছে দেওয়ার লড়াইয়ের গল্প শোনান। তিনি বলেন, একটি বই কীভাবে একটি গ্রামের অন্ধকার দূর করতে পারে, তা আমি প্রতিনিয়ত দেখি। শিক্ষালোক যেভাবে তৃণমূলের এই নিরব বিপ্লবীদের সম্মানিত করল, তা দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা শত শত পাঠাগার সংগঠকদের আরও দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি যে তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানদণ্ড, এই সম্মিলন যেন সেই ধ্রুব সত্যকে আবারও নতুন করে মনে করিয়ে দিল। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে ফজলুল বারি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, শিক্ষালোকের এই যাত্রা কোনো একক ব্যক্তির নয়, এটি একটি যৌথ স্বপ্নের নাম। যারা এক যুগ ধরে এই বুলেটিনটিকে ভালোবেসে লেখা দিয়েছেন, পড়েছেন এবং এর প্রসারে কাজ করেছেন, তাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই আজ আমরা এই মিলনমেলায় বসতে পেরেছি। সমাজের অন্ধকার দূর করতে হলে এরকম ছোট ছোট প্রদীপ চারদিকে জ্বেলে দিতে হবে।

অনুষ্ঠানটির সফল সমাপ্তি টানতে গিয়ে নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান উপস্থিত সকলকে আশ্বস্ত করেন যে, আগামী দিনগুলোতে শিক্ষালোক কেবল একটি পত্রিকা হিসেবে নয়, বরং শিক্ষা ও মুক্তচিন্তা বিকাশের একটি শক্তিশালী সামাজিক মঞ্চ হিসেবে তার ভূমিকা পালন করে যাবে।

শ্যামলীর সেই আষাঢ়ে সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে যখন অনুষ্ঠান শেষ হলো, তখন উপস্থিত প্রত্যেকের মনেই ছিল এক গভীর তৃপ্তি ও আশাবাদের রেশ। বাইরে তখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামার কথা ছিল। কিন্তু অনুষ্ঠান শেষে মেঘ কেটে এক পশলা রোদের ঝিলিক আলোকিত করেছিল মেগাসিটির পুরোটা। ভেতরে জমে থাকা চিন্তার স্ফুলিঙ্গগুলো এক নতুন ভোরের বার্তা দিচ্ছিল। শিক্ষালোকের সম্মিলনটি এই শিক্ষাই দিয়ে গেল যে, আমলাতন্ত্রের রুক্ষতা আর সমাজবিচ্ছিন্নতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে যদি আন্তরিক ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করা যায়, তবে শিক্ষার আঙিনায় অবশ্যই একদিন বসন্তের আগমন ঘটবে। মেধার মূল্যায়ন, গুণের কদর আর সংকটের সঠিক ব্যবচ্ছেদ– এই তিনের সমন্বয়ে শিক্ষালোকের এই ৮ম সম্মিলন দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক স্মরণীয় মাইলফলক হয়ে থাকবে।

শিক্ষালোক সম্মাননা ২০২৬

শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম

বরেণ্য চিন্তাবিদ অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম ১৯৪০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পাবনার ঈশ্বরদীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট অব লিবারেশন ওয়ার অ্যান্ড বাংলাদেশ স্টাডিজের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকও তিনি। ১৯৫৭ সালে ঈশ্বরদী সাঁড়া মাড়োওয়ারি হাই স্কুল থেকে তিনি এসএসসি ও ১৯৫৯ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পর রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে রসায়ন শাস্ত্রে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পাস করেন।

অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানের দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, সভ্যতা, প্রকৃতি-পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে লিখে চলেছেন। তাঁর লেখা সমাজে বিদ্যমান কূপমণ্ডূকতা, কুসংস্কার, অনৈতিকতা, সংকীর্ণতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে। জার্নাল, সাময়িকী ও বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। তিনি এক সমানাধিকারভিত্তিক বৈষম্যহীন উন্নত সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী যা বৈজ্ঞানিক কল্পনা ও যুক্তিভিত্তিক।

শিক্ষা নিয়ে তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাশীল কাজ রয়েছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক সংকটসমূহ, সেগুলোর ঐতিহাসিক শিকড়, অনগ্রসরতা, রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি ইত্যাদি তুলে ধরেছেন তিনি। মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে তাঁর লেখা ও গ্রন্থ আমাদের শিক্ষাচিন্তার জগৎকে সমৃদ্ধ করতে অবদান রেখেছে। অনুবাদের মাধ্যমেও তিনি পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন।

আত্মপ্রচারবিমুখ এই জ্ঞানসাধকের রচিত বইসমূহের মধ্যে শিক্ষাভাবনা, প্রসঙ্গ: শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্তশাসন, জাতীয়তাবাদ: সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, অনুদিত গ্রন্থ চিন্তার স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস (মূল: জে. বি. বিউরি), বিজ্ঞানের দর্শন, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ মিথ ও বাস্তবতা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিবেশ ও বিজ্ঞানে অবদান রাখার জন্য ২০১৩ সালে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

শিক্ষালোক সম্মাননা ২০২৬

শিক্ষালোক সম্মাননা ২০২৬

কবি
সৈকত হাবিব

সৈকত হাবিবের সৃজনচর্চার প্রকাশ-সূচনা নব্বইয়ের দশকের শুরুতে। কবিতা ও গদ্য উভয় মাধ্যমেই সক্রিয় ও শক্তিমান। ওই দশকটিতে বিশুদ্ধ ছোটকাগজ চর্চায় যে গুটিকয় সৃষ্টিশীল মানুষ ভূমিকা পালন করেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। সৃজনশীলতা, সাংগঠনিকতা ও সাংবাদিকতা তিন ক্ষেত্রেই তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন।

১৯৯৩ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছোটকাগজ প্রতিশিল্প দেশের ছোটকাগজ-আন্দোলনে ব্যতিক্রমী ও সাহসী উদাহরণ। এছাড়া সে সময় বিভিন্ন ছোটকাগজের সৃষ্টি ও বিকাশে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছেন। প্রায় তিন যুগ ধরে লেখালেখি করলেও এবং দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সৈকত হাবিব যথেষ্ট প্রচারবিমুখ। লেখেন যেমন অল্প, প্রকাশ করেন তার চেয়েও কম।

কবিতার বাইরে তাঁর প্রধান আগ্রহের অঞ্চল জীবনানন্দের সৃষ্টিজগৎ, বিশ শতকের কবিতা ও ছোটকাগজ। তাঁর বহু কবিতা, প্রবন্ধ, শিল্প ও সাহিত্য সমালোচনা, রাজনৈতিক নিবন্ধ, কলাম দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

জন্ম ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, কুমিল্লার দাউদকান্দিতে। শৈশবে অফুরন্ত সবুজ, সহজ প্রকৃতি আর তিতাস ও গোমতীর তীরে বেড়ে উঠেছেন। জটিল নগরজীবনেও নিজের ভেতরে গ্রামীণ সারল্য আর লেখার ভেতরে প্রকৃতির সহজতা ধরে রেখেছেন। ভালোবাসেন বিচিত্র বিষয়ে পড়াশোনা আর ভ্রমণ।

তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে কাব্যগ্রন্থ: শহর যৌবন ও রাত্রি [২০০৪], আমরা কেবলই চায়ের টেবিলে ঝড় [২০০৭], রক্ত দিয়ে লেখো কবিতা [২০১৫] ও কবিতাসংগ্রহ [২০২৫]। প্রবন্ধগ্রন্থ : কবিতার ডানা [২০০৭] ও কবি কবিতা ও কথা [২০১৩]। গবেষণা-সম্পাদনা: বনলতা সেন: ষাট বছরের পাঠ [২০০৪] এবং বুদ্ধিজীবী: ইতিহাস অনুসন্ধান ও আত্মপাঠ [২০১৩]। এছাড়া সম্পাদনা করেছেন হাসান আজিজুল হক রচনাবলি [প্রামাণ্য সংস্করণ]।

পেয়েছেন বগুড়া লেখক চক্র পুরস্কারসহ বিভিন্ন স্বীকৃতি ও সম্মাননা।

শিক্ষালোক সম্মাননা ২০২৬

পাঠাগার সংগঠক আবদুস ছাত্তার খান

সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলনের সভাপতি আবদুস ছাত্তার খান ১৯৮১ সালের মে মাসে টাঙ্গাইল জেলার অর্জুনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯৮ সালে ভূঞাপুরের ইব্রাহিম খাঁ কলেজ থেকে এসএসসি পাস করে ঢাকা কলেজ থেকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর সম্পন্ন করেন। এরপর ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড কোর্স সম্পন্ন করেন।

পড়ালেখা শেষে ঢাকার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা শুরু করেন। ঢাকা কলেজে পড়ার সময় নিজ গ্রামের তরুণদের নিয়ে তৈরি করেন অর্জুনা অন্বেষা পাঠাগার। পরে এই পাঠাগারের অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করেন গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন যা সারা দেশে পাঠাগার বিস্তারে তরুণদের মনে আগ্রহের সৃষ্টি করে চলেছে।

২০১৩ সালে নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন হাজী ঈসমাইল খাঁ কারিগরি কলেজ। গোবিন্দ গঞ্জের সাঁওতাল পল্লীতে শ্যামল মঙ্গল পরেশ স্মৃতি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন। নিজ গ্রামে তরুণদের সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য 'প্রাচ্য ক্রীড়া সংঘ', সাংস্কৃতিক সংগঠন 'গঙ্গাফড়িং একাডেমি' ও বিজ্ঞানচর্চার জন্য 'লুব্ধক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তাঁর প্রচেষ্টায় ২০২২ সালের ২২-২৪ শে ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের অর্জুনায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ৩ দিন ব্যাপি পাঠাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগার আন্দোলনকে আরো গতিশীল করার জন্য ওই সম্মেলনে সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলন নামে একটি সংগোঠন গড়ে ওঠে যার সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। তাঁর স্বপ্ন বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে পাঠাগার স্থাপন।

শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ায় পরিবর্তন প্রয়োজন

আলাউল হোসেন

শিক্ষাব্যবস্থার সংকটকে যদি কেবল প্রশ্নফাঁস, নকল, অটোপাস কিংবা পরীক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়, তাহলে আমরা সমস্যার কেবল উপসর্গ দেখব, রোগটিকে নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ অভিভাবক, এমনকি শিক্ষক কখনোই অটোপাস বা নকলনির্ভর শিক্ষা চান না। বরং তাঁরা চান তাঁদের সন্তান প্রকৃত অর্থে শিখুক। তাই বড় প্রশ্ন হলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক সমস্যা কোথায়?

গত দুই দশকের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা বলে, আমরা সমস্যার শিকড়ে না গিয়ে বারবার ডালপালা ছাঁটছি। গাছের গোড়ায় পানি না দিয়ে পাতায় পানি ঢাললে যেমন বৃক্ষ সবল হয় না, তেমনি শিক্ষাব্যবস্থাও কেবল নিয়ম পরিবর্তন বা পরীক্ষা কঠোর করলেই বদলে যায় না।

একটি সহজ প্রশ্ন করা যাক। প্রথম শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত টানা ১২ বছর ইংরেজি পড়ার পর দেশের কতজন শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে একটি ইংরেজি অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে পারে? কতজন বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলো আয়ত্ত করতে পারে? বাস্তবতা অত্যন্ত হতাশাজনক। অথচ ফলাফলের খাতায় জিপিএ-৪ কিংবা জিপিএ-৫-এর ছড়াছড়ি। এর অর্থ, আমরা জ্ঞানের চেয়ে নম্বর উৎপাদনে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছি।

চলতি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ইংরেজি প্রশ্নই তার একটি উদাহরণ। এমন অনেক প্রশ্ন এসেছে, যা দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর বাস্তব প্রস্তুতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রশ্নপত্র এমন হওয়া উচিত, যা মেধার যথাযথ মূল্যায়ন করবে; কিন্তু শিক্ষার্থীর বাস্তব শিক্ষাগত অবস্থাকেও বিবেচনায় রাখবে। অন্যদিকে আমরা দেখছি, কয়েক মাসের একটি ভালো স্পোকেন ইংলিশ কোর্স শেষ করে অনেক শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে ইংরেজি পড়তে ও বলতে শিখছে। তাহলে ১২ বছরের বিদ্যালয়ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার কোথায় ঘাটতি রয়ে গেলো এই প্রশ্ন কি আমাদের করা উচিৎ নয়?

এই সংকট শুধু ইংরেজিতে সীমাবদ্ধ নয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী শুদ্ধ বাংলা লিখতে পারে না, শুদ্ধ বানানেও দুর্বল। অথচ তাদের কাছ থেকে সৃজনশীল উত্তর প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কিন্তু আগে কি আমরা তাদের সৃজনশীলভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছি? দেশের কত শতাংশ শিক্ষক সেই উপযোগী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) শিক্ষার অবস্থাও একই রকম। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত কম্পিউটার ল্যাব নেই। এমন এলাকাও আছে, যেখানে অনেক শিক্ষার্থী জীবনে একটি কম্পিউটার কাছ থেকে দেখেনি। অথচ তাদের আইসিটি শেখানো হচ্ছে বই মুখস্থ করিয়ে। প্রযুক্তি কি কখনো মুখস্থ করে শেখানো যায়? বাস্তব অনুশীলন ছাড়া এই শিক্ষা কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার একবার বলেছিলেন, তিনি ক্লাসের সবচেয়ে দুর্বল শিক্ষার্থীকে মাথায় রেখে পাঠদান করতেন। কারণ দুর্বল শিক্ষার্থী বুঝতে পারলে মেধাবীরাও সহজেই বুঝে যায়। এই দর্শনের মধ্যে শিক্ষার প্রকৃত মানবিকতা লুকিয়ে আছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের জাতীয় সিলেবাস অনেক ক্ষেত্রেই এমন শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে তৈরি হয়, যারা নটরডেম, ভিকারুননিসা, হলিক্রস, ক্যাডেট কলেজ, জেলা স্কুলসহ দেশের নামীদামী স্কুল কলেজের মতন সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু দেশের প্রত্যন্ত গ্রামের সেই শিক্ষার্থী, যার বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, ল্যাব নেই, লাইব্রেরি নেই, তার বাস্তবতা কি একই? মফস্বলের শিক্ষার্থীর সঙ্গে রাজধানীর অভিজাত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর একই প্রশ্নপত্র, একই প্রত্যাশাও কি ন্যায়সঙ্গত?

শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রতিযোগিতা নয়, সক্ষমতা তৈরি। মুখস্থ নয়, উপলব্ধি। নম্বর নয়, দক্ষতা। আর সেই কারণেই সিলেবাস, পাঠদান ও মূল্যায়ন সবকিছু পরিকল্পনা করতে হবে দেশের শতভাগ শিক্ষার্থীর বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে, কেবল সেরা দশ শতাংশকে সামনে রেখে নয়।

নকল বন্ধ করতে আইন প্রয়োজন, কিন্তু তারও আগে প্রয়োজন এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে শিক্ষার্থী শিখতে আগ্রহী হবে। শিক্ষা যখন আনন্দের হবে, শেখা যখন জীবনের সঙ্গে যুক্ত হবে, তখন ইচ্ছে করেও শিক্ষার্থীদের দিয়ে নকল করাতে পারবেন না।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার কেবল মন্ত্রী বদল বা নীতিমালা পরিবর্তনের বিষয় নয়। এটি একটি জাতীয় আত্মসমালোচনার বিষয়। আমরা যদি সত্যিই পরিবর্তন চাই, তাহলে সমস্যার শিকড়ে হাত দিতে হবে। কারণ গাছের গোড়ায় পানি না দিয়ে পাতায় পানি ঢেলে কখনোই একটি বৃক্ষকে সবুজ করা যায় না।

লেখক: শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, শিক্ষালোক

আমরা আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ

মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার সহধর্মিণী নাঈমা খাতুন এবং নাতি-নাতনি উমাইজা শারমীন হুদা ও ইয়াহান আলম হুদা শিক্ষালোকের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা স্মারক গ্রহণ করছেন

প্রধান অতিথি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের হাতে শিক্ষালোক স্মারক তুলে দিচ্ছেন শিক্ষালোকের সম্পাদক ফজলুল বারি

বক্তব্য রাখছেন সিদীপের চেয়ারম্যান ও শিক্ষালোকের সম্পাদক ফজলুল বারি

বক্তব্য রাখছেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক ও শিক্ষালোকের প্রধান সম্পাদক মিফতা নাঈম হুদা

'শিশুর শিক্ষা অধিকার: নানা দিক' বিষয়ে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখছেন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ খান মো. রবিউল আলম

শিক্ষালোক স্মারক গ্রহণ করছেন কথাসাহিত্যিক আহমদ বশীর

বক্তব্য রাখছেন সিদীপের পরিচালনা পরিষদ সদস্য মাসুদা বানু ফারুক রত্না

বক্তব্য রাখছেন সিদীপের পরিচালনা পরিষদ সদস্য ফাহমিদা করিম

ক্যাডেট শফিউল স্মৃতি পাঠাগার উদ্বোধন

মৈন্দ গ্রামের অবিকশিত অগ্নিকুসুম

মনিরুল ইসলাম শ্রাবণ

সব মৃত্যুই শোকের মাধ্যমে শেষ হলেও কিছু মৃত্যু প্রেরণার উৎস হয়ে থাকে। ক্যাডেট মো. শফিউল আলম (কাজল)-এর মৃত্যু ঠিক সেই রকমই কিছু। ২২ বছর আগে একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ১৭ বছরের দুরন্ত কিশোর শফিউলের। সিলেট ক্যাডেট কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিল শফিউল। পড়াশোনা থেকে শুরু করে খেলাধুলা, মানবিক কাজ এবং আচার-ব্যবহারে সকলের মন জয় করে নিয়েছিল অল্প বয়সি এই কিশোর। বাবা-মা, গ্রামের লোকজন, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও স্বপ্ন দেখেছিলেন কাজলকে নিয়ে।

স্বপ্ন দেখেছিল কাজল নিজেও। গায়ে সেনাবাহিনীর পোশাক জড়িয়ে একদিন বাবা-মাকে স্যালুট করবে, দেশের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেবে- সেরকমই প্রস্তুতি ছিল তার। কিন্তু নিজের আর পরিবারের সবার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় আকস্মিক এক দুর্ঘটনায়। এসএসসি পরীক্ষার পর ৪০ দিনের জন্য তাবলিগে গিয়েছিল রাজশাহীতে। সেখানের এক পুকুরে সাঁতার কাটার জন্য ঝাঁপ দিতেই পানির নিচে থাকা পুরাতন সিঁড়ির সাথে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে তার। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রথমে রাজশাহী হাসপাতালে এবং পরবর্তীতে তাকে ঢাকা সিএমএইচ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ৯ দিন এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ২০০৪ সালের ৪ মে মাত্র ১৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে এই মেধাবী শিক্ষার্থী।

শফিউলের মৃত্যুতে তার বাবা-মা, ভাই-বোন শোকাহত হলেও ভেঙে পড়েননি। চোখের আড়াল হলেও তারা তাকে মনের আড়াল হতে দেননি। শফিউলের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তার স্মৃতিকে ধারণ করে রাখার জন্য একটি পাঠাগার গড়ার উদ্যোগ নেয় তারা। পাঠাগারটি পারিবারিক পাঠাগার হিসাবেই পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু একটা সময় তারা পাঠাগারটিকে তাদের গ্রামের সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার পরিকল্পনা করেন। এ লক্ষ্যে শফিউলের পিতা পাঠাগারে জন্য এক টুকরো জমি দান করে দেন। তারপর দীর্ঘ চেষ্টায় গ্রামবাসী, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের সম্মিলিত সহযোগিতায় শফিউলের বড় ভাই মাহবুব সম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার মজলিশপুর ইউনিয়নের মৈন্দ গ্রামের সরকার বাড়িতে প্রয়াত ক্যাডেট শফিউলের স্মৃতি রক্ষার্থে এই পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 'পড়ি বই, মানুষ হই' স্লোগান নিয়ে তার নামে যাত্রা

ক্যাডেট শফিউল স্মৃতি পাঠাগার ও সমাজ বিকাশ কেন্দ্রে লেখক

শুরু করে 'ক্যাডেট শফিউল স্মৃতি পাঠাগার ও সমাজ বিকাশ কেন্দ্র'। এ উপলক্ষে গত ০২ মে ২০২৬ একটি বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তথা আলোচনা সভা ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় প্রায় ১৫জন শিশু-কিশোরদের চমৎকার কবিতা পাঠে মুখরিত আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও দেশবরেণ্য গুণীজন। ক্যাডেট শফিউলের বড় ভাই মাহবুব উল আলম ভাইয়ের আমন্ত্রণে গিয়ে মৈন্দ গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যেমন মুগ্ধ হয়েছি, তেমনই মুগ্ধ হয়েছি পাঠাগারটির নান্দনিকতায়, আয়োজনের আড়ম্বরতায় এবং এলাকাবাসীর আতিথেয়তায়।

আনুষ্ঠানিকতার শুরু হয় ক্যাডেট শফিউলের পিতা এ.কে.এম শফিকুল ইসলামের পাঠাগার উদ্বোধনের ঘোষণার মাধ্যমে। একজন শোকাহত পিতা শোনালেন তার সন্তান হারানোর ব্যথার কথা, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার কথা। প্রিয় সন্তান হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরের কথা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মজলিশপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামরুল হাসান। তাঁর দেয়া বক্তব্যে ভবিষ্যতে তিনি এই পাঠাগার পরিচলানায় নিজের সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা বললেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত দেশবরেণ্য কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশীদ। বক্তব্যে তিনি বলেন, প্রাণী জগতের সব প্রাণী জন্ম হওয়ার পরে তাকে লেখাপড়া করার দরকার হয় না। লেখাপড়া ছাড়াই একটি বাঘ বাঘ হিসেবে বেড়ে ওঠে, হরিণ হরিণ হিসেবে, কুকুর-বিড়াল কুকুর-বিড়াল হিসেবে। একমাত্র মানুষই এমন প্রাণী, যাকে মানুষ হয়ে গড়ে উঠার জন্য জ্ঞান অর্জন করতে হয়, বিদ্যালয়ে যেতে হয়, পাঠাগারে যেতে হয়, বই পড়তে হয়। নিজে আলোকিত হয়ে সমাজকে আলোকিত করার যে সম্ভাবনা শফিউলের মাঝে ছিল, সেই সম্ভাবনা এই পাঠাগারের মাধ্যমে অন্যদের মাঝে তৈরি হবে বলে আমি মনে করি। শফিউলের স্মৃতি জেগে থাকবে এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে। বক্তব্যে তিনি আরো বলেন, অবিকশিত অগ্নি কুসুম, প্রচুর সম্ভাবনাময় একজন ছেলে ছিল কাজল। তাঁর ভেতরে সম্ভাবনা ছিল আগুনের মতো, কুসুমের মতো, ফুলের মতো। সেই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা দেখতে পাইনি। তার অকাল মৃত্যু যে সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছে, এই পাঠাগারটি সেই অসম্পূর্ণ কাজটি বাস্তবায়ন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমাদের সকলের কাজ হচ্ছে সম্মিলিতভাবে এই প্রচেষ্টাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং এগিয়ে নেওয়া।

অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন দেশের বিশিষ্ট কবি, গবেষক ও প্রকাশক সৈকত হাবিব। উপস্থাপক যখন বলেন যে, আজকের মুখ্য আলোচক এই পাঠাগারের জন্য ১০১টি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রদান করেছেন। তখন উপস্থিত সকলে করতালির মাধ্যমে তাকে অভিবাদন জানায়। উন্নত সমাজ গঠনে পাঠাগারের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাঠাগার আন্দোলন, ভিন্ন ধর্মে বই পড়ার উপর যে নির্দেশনা আছে তার কথা বলেন। বলেন পাঠাগারের মাধ্যমে একটি দেশ, একটি সমাজ, একটি প্রজন্ম কীভাবে এগিয়ে থাকে সেসব কথা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র সংগীত সম্মিলন পরিষদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সভাপতি প্রাবন্ধিক-গবেষক, অধ্যাপক মানবর্দ্ধন পাল। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় বই পড়ার উপর গুরুত্বারোপ করলেন। বললেন বিখ্যাত মনীষীদের বই পড়া নিয়ে নানা উক্তির কথা।

আরেক বিশেষ অতিথি বেসরকারি গণগ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি, কথাসাহিত্যিক আমির হোসেন তাঁর বক্তব্যে বই পড়ার গুরুত্ব বর্ণনাসহ পাঠাগার আন্দোলনের নানা দিক বর্ণনাসহ এই পাঠাগারটি রেজিস্ট্রেশন ও বই সংগ্রহসহ নানা ধরনের সহযোগিতার কথা বলেন।

বক্তব্য রাখছেন উদ্বোধক এ.কে.এম শফিকুল ইসলাম (ক্যাডেট শফিউলের পিতা)

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশীদ

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন, মৈন্দ স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তফা মাহমুদ হায়দার, বুধল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহেদ আলী, বজলুর রহমান পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ফজিলাতুন্নাহার, বিশিষ্ট সমাজ সেবক নিয়ামত খান প্রমুখ। গ্রামের বিশিষ্টজনদের মধ্যে কয়েকজন তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তাদের প্রত্যেকের বক্তব্যে উঠে এসেছে প্রয়াত শফিউলের কথা, শফিকুলের পিতা, ভাই এবং তাদের স্বপ্নের কথা। বই পড়া ও সামাজিক আন্দোলনের কথা। তারা সবাই পাঠাগারটির উন্নয়নে নিজেদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে ঘোষণা দেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মো. মাহবুব উল আলম। তিনি তাঁর হারিয়ে যাওয়া স্নেহের ছোট ভাইয়ের জীবনী ও মৃত্যুসময়কার ঘটনা প্রবাহের লিখিত স্মৃতিগুলো পড়ে শোনান। বক্তব্যে তিনি পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান রয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, বই পড়া কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের মানুষ; বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিতরণসহ গ্রামের সকল ভালো কাজ তথা সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এই প্রতিষ্ঠানটি।

আবৃত্তিশিল্পী তাসফিয়া ইসলাম প্রমি ও মাসুম সরকারের সঞ্চালনায় প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানটিতে গ্রামের স্কুল ও কলেজগামী শিক্ষার্থীরা ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করে। ছোট ছোট শিশুদের চমৎকার সব আবৃত্তিতে মুগ্ধ হন সবাই। এক পর্যায়ে কথাসাহিত্যিক আমির হোসেন ও আমি পাঠাগারের জন্য আনা উপহারের বই প্রদান করি। এখানে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো এই অনুষ্ঠানের অথিদের বরণ করা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন লেখকের বই উপহার প্রদানের মাধ্যমে। অর্থাৎ ফুলের পরিবর্তে বই দিয়ে অতিথি বরণ। বিষয়টি নূতন, অনন্য এবং অনুকরণীয় বলে আমার মনে হলো।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ ফিতা কেটে পাঠাগারে প্রবেশ করেন। তারা পাঠাগার পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন রেজিস্টারে তাদের মন্তব্য লেখেন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আমি লিখলাম- 'আকালে ঝরে যাওয়া এক ফুল, ক্যাডেট শফিউল/তোমাকে মনে পড়ছে আজ, সবার মুখে তাই বিষাদের সাজ!/ভুলবো না তোমায়, স্মরণ রাখবো মনে,/তোমার প্রেরণায় ভূমিকা রাখবো সমাজ উন্নয়নে।'

অতিথিদের নিয়ে নিমগাছ রোপণ করছেন মজলিশপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কামরুল হাসান

সবশেষে পাঠাগারের আঙিনায় একটি নিমগাছ রোপণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। নিম গাছ যেমন চারপাশ থেকে দূষিত বাতাস শোষণ করে প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ বাতাস ছড়িয়ে দেয়। একটি পাঠাগারও তেমন সমাজ থেকে দূষিত ক্রিয়াকলাপ দূরীভূত করে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে ভূমিকা রাখে। নিম গাছ যেমন শরীরের বিভিন্ন রোগ দূর করে মানবদেহকে সুস্থ-সবল করে তোলে, তেমনভাবে পাঠাগারও মানবমনের অন্ধকার/অসুখ দূর করে মানবমনকে সুস্থ ও সতেজ রাখে- এই বার্তাটিই যেন দিতে চাইলেন পাঠাগারের উদ্যোক্তাগণ।

লেখক: কবি ও সংগঠক

বৃক্ষপ্রেমী এক প্রতিবেশী

শিউলী আক্তার

গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, ছায়া দেয়, খাদ্য দেয় এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। তাই সচেতন মানুষরা সবসময় বেশিবেশি গাছ লাগানোর কথা বলেন। আমার পরিচিত এমনই একজন মানুষ হলেন মো. শাহ আলম ভূঁইয়া। তিনি একজন সত্যিকারের বৃক্ষপ্রেমী মানুষ।

সিদীপ পরিবেশ রক্ষা, গাছ লাগানো এবং মানুষকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিশেষ করে তালগাছ ও শজনে গাছের গুরুত্ব নিয়ে সিদীপ নিয়মিত সভা, আলোচনা ও সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের আয়োজন করে। কারণ তালগাছ পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বজ্রপাত থেকে ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে। অন্যদিকে শজনে গাছ অত্যন্ত উপকারী ও পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ একটি গাছ। এর পাতা, ফল ও ডাঁটা মানুষের শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

সিদীপ থেকে গাছ ও পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন বই, লিফলেট ও সচেতনতামূলক প্রকাশনা বের করা হয়। এসব বইয়ে গাছের উপকারিতা, পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা এবং বাড়ির আশেপাশে কিভাবে গাছ লাগাতে হয় তা সহজভাবে তুলে ধরা হয়। মো. শাহ আলম ভূইয়া এসব বই-লিফলেট পড়ে অভিভাবক সভা এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম দেখে গাছপালার প্রতি আরো বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে তাল ও শজনে গাছের গুরুত্ব তাকে খুব অনুপ্রাণিত করে। এরপর থেকেই তিনি নিজের বাড়ির উঠানে বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগানো শুরু করেন।

প্রথমে তিনি কয়েকটি তাল ও শজনে গাছ রোপণ করেন। বর্তমানে তার উঠানে লালশাক, পালং শাক, পুঁই শাক, কলমীশাক, মরিচ, বেগুনসহ বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি চাষ হয়। এছাড়াও পেঁপে, লেবু, কলা, পেয়ারা, আমসহ নানা ধরনের ফলের গাছ রয়েছে। তার বাড়ির চারপাশ এখন যেনো একটি ছোট্ট সবুজ বাগানে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গাছ রোপণ ও গাছের পরিচর্যা তার নেশা এবং ভালোবাসা। অবসর সময় পেলেই তিনি গাছের যত্ন নেন। কখনো মাটি কুপিয়ে দেন, কখনো আগাছা পরিষ্কার করেন। আবার কখনো নতুন চারা রোপণ করেন। প্রতিদিন সকালে তাকে গাছে পানি দিতে দেখা যায়। কোনো গাছ শুকিয়ে গেলে তিনি কষ্ট পান। আবার নতুন কোনো গাছে ফুল বা ফল ধরলে তিনি খুব আনন্দিত হন। গাছের প্রতি তার এই আন্তরিকতা সত্যিই প্রশংসনীয়।

মো. শাহ আলম ভূইয়া নিজে গাছ লাগিয়ে থেমে থাকেননি, তিনি আশেপাশের মানুষদেরও গাছ লাগাতে উৎসাহ দেন। তার কাজ দেখে এলাকার অনেক মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছে। আগে যারা বাড়ির উঠান খালি রাখতেন, তারাও এখন বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগাচ্ছেন। বিশেষ করে শিশু ও তরুণদের মধ্যে গাছ লাগানোর আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান সময়ে পরিবেশ দূষণ, অতিরিক্ত গরম এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের জীবনে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে বেশি বেশি গাছ লাগানো অত্যন্ত জরুরি। তাই মো. শাহ আলম ভূঁইয়ার মতো মানুষ, সমাজের জন্য সত্যিই অনুকরণীয়। তিনি প্রমাণ করেছেন, একজন মানুষ চাইলে পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। তার উঠানে গেলে মন ভালো হয়ে যায়। অনেক সময় তিনি নিজের বাগানের উৎপাদিত শাকসবজি আশেপাশের মানুষের সঙ্গে ভাগাভাগিও করেন। এতে মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরো সুন্দর হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় মো. শাহ আলম ভূঁইয়া সত্যিকারের বৃক্ষপ্রেমী মানুষ। সিদীপের বিভিন্ন সভা, প্রোগ্রাম সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং বই থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নিজের বাড়িকে সবুজে ভরিয়ে তুলেছেন। বৃক্ষরোপণ তার পেশা নয় বরং তার নেশা ও ভালোবাসা। তার মতো মানুষ সমাজে যত বেশি থাকবে, আমাদের দেশ তত বেশি সবুজ সুন্দর ও বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

লেখক: শিক্ষা সুপারভাইজার, রায়পুর (গৌরিপুর) শাখা, সিদীপ, কুমিল্লা

সেলিনা আক্তারের পাশে সিদীপ

হাবিবুর রহমান

আমি মো. হাবিবুর রহমান ওডিসিও (ওভার ডিউ কালেকশন অফিসার) হিসাবে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাক্টিসেস (সিদীপ) এ সোনারগাঁ ব্রাঞ্চে অনাদায়ী ওভার ডিউ সদস্য ও রাইট অফ সদস্য নিয়ে কাজ শুরু করি। এখানে কাজের সুবাদে পারিবারিক কঠিন দুঃসময় পার করা এক সংগ্রামী নারীর সংগ্রাম করে টিকে থাকার গল্প শেয়ার করব। সোনারগাঁ উপজেলার হারিয়া গ্রামের বাসিন্দা সেলিনা আক্তার ও তার স্বামী হামিদ মিয়ার সংসার চলছিল ঠিকঠাক। সরকারি ভূমি অফিসে হামিদ মিয়া চাকরি করতেন। তার সংসারে ছিল তিন ছেলে ও এক মেয়ে। সালটা ছিল ২০২০, করোনা ভাইরাসের দাপটে পুরো দেশ এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে হামিদ মিয়া সে সময় মারা যান। সেলিনা আক্তারের সংসারে নেমে আসে চরম অভাব ও ছেলেমেয়েদের কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে তার দুশ্চিন্তা। কিন্তু সেলিনা আক্তার দমে যাওয়ার পাত্রী নন। তিনি তার ছেলেদের কর্মমুখী করার জন্য বিভিন্ন উপায় খুঁজতে থাকেন। এক প্রতিবেশীর সহযোগিতায় বড় ছেলে রনি মিয়াকে প্রবাসে যাওয়ার জন্য সবকিছু ঠিকঠাক করেন, কিন্তু ছেলেকে প্রবাসে পাঠাতে প্রয়োজন প্রায় চার লক্ষ টাকা। এতগুলো টাকা সেলিনা বেগম কোথায় পাবে সেই দুশ্চিন্তায় তার দিন রাত কাটতে থাকে। স্থানীয় এক লোকের মাধ্যমে সিদীপের সোনারগাঁ শাখায় যোগাযোগ করেন। সেলিনা বেগমের এই দুঃসময়ে সিদীপ সোনারগাঁ শাখা তার পাশে দাঁড়ায়। ১৪ জুন ২০২৩-এ তাকে তিন লক্ষ টাকা উবিকা (উদ্যোক্তা বিকাশ কার্যক্রম) ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করা হয়। এই টাকা দিয়ে বড় ছেলে রনি মিয়াকে মালয়েশিয়ায় পাঠাতে সক্ষম হয়। তার ছেলের প্রবাস জীবন চাকুরী থাকা-খাওয়া ভালোই চলতে থাকে। প্রতি মাসে মাসে রনি মিয়া তার মায়ের কাছে টাকা পাঠায়। এই টাকা দিয়ে সেলিনা বেগমের সংসার খরচ ও ঋণ পরিশোধ সুন্দরভাবে চলতে থাকে। এইভাবে এক বছর চলার পর হঠাৎ রনি মিয়ার কোম্পানিতে কাজ না থাকায় বেতন বন্ধ হয়ে যায়। সেলিনা বেগম সঠিকভাবে ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। প্রায় দুই বছর লেনদেন বন্ধ থাকে সেলিনা বেগমের। সেই সুবাদে সেলিনা বেগমের কাছে তার খেলাপির প্রকৃত কারণ ও বর্তমান অবস্থা জানতে চাইলে তিনি সবকিছু বলেন। সিদীপের আর্থিক সহায়তার কথা অকপটে স্বীকার করেন ও আবেগে কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন 'আমি পরিস্থিতির শিকার হয়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হই তবুও আমার সাথে কোন ধরনের খারাপ আচরণ করা হয়নি বরং তারা আমার বাসায় এসে আমাকে সাহস যুগিয়েছে ও ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়েছে, আমি জীবনে যতদিন বাঁচবো সিদীপের সহযোগিতার কথা ভুলবোনা। কারণ এই আর্থিক সহযোগিতার কারণে আমার ছেলেকে প্রবাসে পাঠাতে পেরেছি আমার মেয়েটার বিয়ে দিয়েছি। বর্তমানে আমার সংসার জীবনটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। আমার ছেলেটা নতুন এক কোম্পানিতে কাজ পেয়েছে এখন সে নিয়মিত বেতন পাচ্ছে। আমার দ্বিতীয় ছেলেটাকেও আমি বিদেশ পাঠাতে সক্ষম হয়েছি।' আমি তাকে বললাম আপনার দুঃসময়ে আমরা আপনাকে সহযোগিতা করেছি এখনো আপনার পাশে রয়েছি। সেলিনা

> আমি পরিস্থিতির শিকার হয়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হই তবুও আমার সাথে কোন ধরনের খারাপ আচরণ করা হয়নি বরং তারা আমার বাসায় এসে আমাকে সাহস যুগিয়েছে ও ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়েছে

বেগমের দুই ছেলের সাথে ফোনে কথা বলে আলাপ আলোচনা করি ও তাদের সহযোগিতা করার কথা বলি। আপনার সংসার খরচ চালিয়ে আমাদের প্রতিমাসে ৫০০০ করে টাকা দিয়ে বাকি টাকা শোধ করবেন। সেলিনা বেগম অনেক খুশি হয় এবং তিনি নিয়মিত এখন টাকা দিচ্ছেন। উনার সাথে কথা বলে আমার খুব ভালো লাগে এবং নিজের কাছে গর্ববোধ করি। আমি এমন একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করি যেই প্রতিষ্ঠান মানুষকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসে। বাংলাদেশে সামাজিক অর্থনৈতিক ও গ্রামীণ পরিবারের কর্মমুখী উন্নয়নের জন্য তাদের সাথে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

লেখক: ফিল্ড অফিসার (ওডিসিও), জিরানীবাজার ব্রাঞ্চ, সিদীপ, ঢাকা

কৃষক আব্দুল হালিম ও সেলিনা বেগমের সফলতার গল্প

সঞ্জীব মন্ডল

আজকে আমরা শুনব মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় মাহমুদপুর গ্রামের একজন কৃষক আব্দুল হালিমের প্রান্তিক কৃষক থেকে সফল কৃষক হওয়ার গল্প। আব্দুল হালিম একজন সাধারণ কৃষক ছিলেন, গ্রামের আর সকল কৃষকের মতোই তিনি গতানুগতিক ফসলের চাষ করতেন। সেক্ষেত্রে দেখা যেত কোন বছর ফসলের ভালো দাম পেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফসলের ভালো দাম পেতো না। তার দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা ছিল ফসল চাষাবাদের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও সঠিক কারিগরি জ্ঞানের অভাব। তার প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় সাথি হিসেবে পাশে দাঁড়ায় সিদীপ।

তার স্ত্রী সেলিনা বেগম সিদীপের রাজদিয়া ব্রাঞ্চের মাহামুদপুর মহিলা সমিতির সদস্য। প্রথমবার তারা ৪০,০০০ টাকা কৃষিঋণ গ্রহণ করেন। ঋণ গ্রহণ করে তারা ৯৫ শতক জমিতে ধানচাষ করেন। তাদের ৯৫ শতক জমিতে বীজ, সার, কীটনাশক ক্রয়সহ সর্বমোট ৫০,০০০ টাকা খরচ হয়। সকল প্রকার খরচ বাদ দিয়ে তারা ধান বিক্রয় করে ৪৫,০০০ টাকা আয় করেন।

দ্বিতীয় ধাপে আবারও ৪০,০০০ টাকা কৃষিঋণ প্রদান করা হয়। এই ঋণের টাকা ও তাদের নিজের কিছু সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে তারা ৫০ শতাংশ জমিতে ধান, ৩০ শতাংশ জমিতে আলু, ৫ শতাংশ জমিতে পেঁয়াজ এবং ৩০ শতাংশ জমিতে সরিষার চাষ করেন।

> কৃষি আমাদের শেকড়, আমাদের সংস্কৃতি। আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য প্রচলিত কৃষিকে আধুনিকায়ন করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই

তারা জমিচাষ, সার ক্রয়, বীজ ক্রয়সহ সকল প্রকার খরচ বাদ দিয়ে ধান চাষে প্রায় ৩৫,০০০ টাকা আয় করেন। এছাড়াও আলু, পেঁয়াজ ও সরিষা চাষ করে যথাক্রমে ৪৫,০০০ টাকা, ৭,০০০ টাকা ও ১২,০০০ টাকা আয় করেন।

বর্তমানে তাদেরকে আবারও ৪০,০০০ টাকা কৃষিঋণ প্রদান করা হয়। এই ঋণের টাকা দিয়ে তারা ৮০ শতাংশ জমিতে ধান, ৩০ শতাংশ জমিতে আলু, ৭ শতাংশ জমিতে পেঁয়াজ এবং ৩০ শতাংশ জমিতে সরিষার চাষ করেন। এবং আশা করছেন বাজার মূল্য ভালো থাকলে এবারও লাভবান হবেন।

এই দম্পতি জানান বহুমুখী ফসলের চাষে তুলনামূলক বেশি লাভবান হওয়া যায়। সিদীপ থেকে প্রাপ্ত কারিগরি সেবা ফসলের রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমন দমনে সাহায্যে করছে এবং পূর্বের থেকে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরি ও ফেরোমন ফাঁদ, জৈব বালাই নাশক প্রয়োগ পদ্ধতি, কৃষি কলসেন্টার ১৬১২৩ নাম্বারের ব্যবহার পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে তাদের দেখে আশেপাশের এলাকার আরও অনেক কৃষক বহুমুখী ফসল চাষে আগ্রহী হচ্ছে।

সিদীপ তাদের কার্যক্রমে ইনোভেশনকে সবসময় প্রাধান্য দিলেও একটি সংস্থা হিসেবে সিদীপ বিশ্বাস করে অর্থনৈতিক মুক্তি তখনই আসবে যখন একটি দেশ তাদের কৃষি কার্যক্রমে আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার করতে শিখবে। কৃষি আমাদের শেকড়, আমাদের সংস্কৃতি। আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য প্রচলিত কৃষিকে আধুনিকায়ন করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। আর তাই সিদীপ তাদের কার্যক্রমে সর্বদা কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে এধরনের সাফল্যের গল্প সবসময়ই আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

লেখক: ফিল্ড অফিসার (এগ্রি), সিরাজদিখান শাখা, সিদীপ, মুন্সিগঞ্জ

জীবনযুদ্ধে সফল একজন কৃষাণী ও মা

মো. ফয়সাল হোসেন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের ছতুরপুর গ্রামের বাসিন্দা মোসা. রোজিনা বেগম, স্বামী মো. নজরুল সরকার। পৈতৃকভাবে পাওয়া ৯০ শতক বসতভিটা জমিতে তারা স্বামী-স্ত্রী কৃষিকাজ করেন এবং কৃষিই তাদের একমাত্র আয়ের পথ। কিন্তু এই কৃষি থেকে তাদের যে পরিমাণ আয় হতো তা দিয়ে অনেক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে তাদের সংসার চলত। দুই ছেলেসহ তার পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা ৪ জন। রোজিনা বেগম ২০২৩ সালে সিদীপের চম্পকনগর শাখায় সদস্য হয়ে সাধারণ ঋণ গ্রহণ করেন এবং ২০২৫ সালে সিদীপ থেকে কৃষিঋণ বা এসএমএপি ঋণ নেয়া শুরু করেন। প্রথম ধাপে তিনি ৩০,০০০ টাকা কৃষিঋণ গ্রহণ করেন এবং এ টাকা দিয়ে তিনি গাভী পালন করেন।

পরবর্তীতে সিদীপ কর্মকর্তারা তাকে বিজয়নগর উপজেলা প্রাণীসম্পদ কমকর্তার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন এবং বর্তমানে তিনি কৃষি অফিস থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে তার সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ হয় এবং এ সমস্ত মাধ্যম দিয়ে তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে প্রাণীসম্পদ সম্পর্কে বেশ ভালো জ্ঞান অর্জন করেন।

সিদীপের পরামর্শে ২০২৪ সালে তিনি শংকর জাতের গাভী পালন শুরু করেন। পাশাপাশি তার বসত বাড়িতে এখন একটি ছোটখাটো লিচুর বাগান ও সবজির বাগান রয়েছে। তার লিচুর বাগানে ২০টি দেশীয় প্রজাতির লিচুর গাছ রয়েছে যার লিচু বিক্রি করলে বছরে ৬০,০০০ হাজার টাকার মত আয় হয়। লিচুর পাশাপাশি তার আরো কৃষি রয়েছে কাকড়ল, কুমড়া, লেবু এবং আম। পাশাপাশি কৃষাণী মোছা. রোজিনা বেগম রাসায়নিক সারের পরিবর্তে বিভিন্ন জৈব সার ব্যবহার করে থাকেন। তার দেখাদেখি গ্রামের অন্যান্য কৃষকও জৈব সার ব্যবহারে উৎসাহিত হচ্ছেন।

বর্তমানে তিনি সিদীপ থেকে গাভী পালন প্রকল্পে ৫০,০০০ টাকা গ্রহণ করেছেন এবং এই টাকা দিয়ে তিনি তার গাভীর খামার আরো বড় করছেন। বর্তমানে চম্পকনগর শাখার কর্মকর্তারা বিজয়নগর উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মতকর্তার সাথে যোগাযোগ করে সেখান থেকে গাভীর ঘাস ও দানাদার খাবার সংগ্রহ করে তাকে দিয়েছেন। মো. নজরুল সরকার খামারের পরিচর্যা, ঘাস চাষ ও নিয়মিত টিকা ব্যবস্থাপনার দিকগুলো দেখছেন এবং এখান থেকে ভালো কিছু পাবেন বলে আশা করেছেন। সিদীপ চম্পকনগর শাখা থেকে তাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে রোজিনা বেগমের খামারে ৬টি গরু রয়েছে যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৩,৫০,০০০ টাকা। রোজিনা বেগম বলেন গরুর খাবার ঘাস, দানাদার খাবার, ঔষধ ও টিকা বাবদ তার বছরে প্রায় ৯০,০০০ টাকার মত খরচ হবে। রোজিনা বেগম বলেন গাভী পালন করে এক বছরে প্রায় ২,০০,০০০-২,৫০,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব।

উল্লেখিত বিভিন্ন প্রকল্প থেকে কৃষক মো. নজরুল মিয়া বছরে প্রায় ২,৫০,০০০ টাকা আয় করতে পারছেন। মোছা. রোজিনা বেগম জানান টাকার অভাবে ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন আর সেই সমস্যা নেই, গাভী, লিচু, সবজি বিক্রী করে এখন আর কোন সমস্যা নেই। সংসারে এখন শান্তি ফিরছে এই কথা বলে রোজিনা বেগম কান্না করে দেন। বলেন এখন ছেলে মেয়েরা ইস্কুলে যায় পড়াশোনা করে খুব ভালো লাগে। কৃষিকাজ থেকে আয়ের টাকায় সংসারে কোন অভাব নেই তাদের আর। ছেলেরা পড়াশোনার পাশাপাশি তাকে খামার ও কৃষি কাজে সহযোগিতা করেন, মোছা. রোজিনা বলেন জীবনে অনেক কষ্ট করেছি তবে এখন আল্লাহ সুখের মুখ দেখিয়েছেন। মো. নজরুল সরকার কৃষিকাজে যেমন সফল তেমনি ব্যক্তিজীবনেও তিনি একজন সফল পিতা।

লেখক: ফিল্ড অফিসার (এগ্রি), ধরখার শাখা, সিদীপ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের কিছু কার্যক্রম

১২ মে ২০২৬-এ সিদীপের মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে সফুরা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন কর্মশালা ও প্রতিযোগিতা এবং শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন চিত্রশিল্পী শিশির মল্লিক এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলম।

গত ১৭ জুন ২০২৬-এ সিংড়া দমদমা পাইলট স্কুল এন্ড কলেজে সেরা পাঠক-পাঠিকা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান এবং পাঠকদের নিয়ে একটি শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলম।

১৮ জুন ২০২৬-এ গাজীপুরের কাশিমপুর শাখার আওতায় কাশিমপুর হাইস্কুল এন্ড কলেজে চিত্রাঙ্কন কর্মশালা ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন চিত্রশিল্পী শিশির মল্লিক।

২১ জুন ২০২৬-এ সিদীপের আশুলিয়া শাখার আওতায় দোসাইদ অধন্য কুমার উচ্চ বিদ্যালয়ে সেরা পাঠক-পাঠিকা পুরস্কার বিতরণ, বই পর্যালোচনা পুরস্কার বিতরণ এবং ইংরেজি গল্প পাঠ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালা পরিচালনা করেছেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক জনাব আলমগীর খান।

২৪ জুন ২০২৬-এ সীতাকুণ্ড সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সেরা পাঠক-পাঠিকাদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান করা হয়।

অনুষ্ঠানগুলোতে বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য সহকারী শিক্ষকবৃন্দ, সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষালোক জানুয়ারি-এপ্রিল ২০২৬ সংখ্যার পরিচিতি

২৪ মে ২০২৬-এ সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের মোহাম্মদ ইয়াহিয়া অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো শিক্ষালোক জানুয়ারি-এপ্রিল ২০২৬ সংখ্যার পরিচিতি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির যুগ্ম পরিচালক জনাব মো. সাহিদুল হাসান এবং সহকারী পরিচালক জনাব মো. আল আমিন। এছাড়াও সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদাসহ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন

২৫ জুন ২০২৬-এ সিদীপের গাজীপুর এরিয়ার পূবাইল ব্রাঞ্চের আব্দুল্লামহ ক্যাডেট একাডেমিতে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করা হয়। মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো. মনিরুজ্জামান এবং বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

২৯ জুন ২০২৬-এ ঢাকায় সিদীপের আদাবর শাখায় মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করা হয়। এ সময় সিদীপের হেড অব মাইক্রোফাইন্যান্স জনাব আবু খালেদসহ এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার আবু সালেহ নূর মোহাম্মাদ, শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান, সিদীপ কেরানীগঞ্জ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মো. সাকিম হোসেন, আদাবর শাখার ব্যবস্থাপক মো. উজ্জ্বল হোসেন, গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলম, গাজী

জাহিদ আহসান এবং মেহেতাজ বিনতে আলম ও শাখার অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উন্নয়নকর্মী মাহফুজ সালাম, চিত্রশিল্পী শিশির মল্লিক। অতিথিরা সিদীপের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

তাল ও শজনে চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

১৮ ও ২০ মে, ২০২৬-এ দুটি ব্যাচে ৪২টি শাখার শিক্ষাসুপারভাইজারদেরকে নিয়ে সিদীপ ভবনে তাল ও শজনে চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সিদীপের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি এবং 'এবং বই' এর সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. আমিন উদ্দিন মৃধা, পুষ্টিবিদ জনাব ফাহমিদা করিম, তালগাছ চাষ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জনাব মো. বাছির উদ্দিন ভূইয়া, শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক জনাব আলমগীর খান এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলম। কর্মশালাটি সমন্বয়

করেন জনাব ফারহানা ইয়াসমিন (সিবি এন্ড ওডি ইউনিটের এ. জি. এম.) গবেষনা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা গাজী জাহিদ আহসান এবং মেহেতাজ বিনতে আলম।

সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিক্ষা সুপারভাইজারদের রচনা প্রতিযোগিতা ২০২৫

প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

“মাতৃভাষা ও শিক্ষা: শতবর্ষের ভাবনা” শীর্ষক গ্রন্থের আলোকে

শিক্ষাসুপারভাইজারদের নাম	শাখা	স্থান
মোছা. ফাহমিদা জেসমিন	বাঘা	১ম
আফরিন সুলতানা	গাউছিয়া	১ম
ফেরদৌসী আক্তার	নগরপাড়	২য়
সামান্তা দুলাল	কুটি	২য়
মোসা. তাহসিনা খাতুন	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩য়
মোসা. কাকলি খাতুন	দেবোত্তর	৩য়
লোপা রাণী সরকার	গোপালপুর-লালপুর	সেরা
মোসা. আফসানা আক্তার	সিদ্ধিরগঞ্জ	সেরা
মোরশেদা আক্তার	বারেরা	সেরা
মাসুদা আক্তার	রাজাবাড়ি	সেরা
শারমিন আক্তার প্রিয়া	ভোলাচং আক্তার	সেরা
বিইটি রানী বড়ুয়া	বাগমারা	সেরা
উর্মি আক্তার	হায়দ্রাবাদ	সেরা
মোছা. সুমি খাতুন	বনপাড়া	সেরা

শিক্ষাসুপারভাইজারদের নাম	শাখা	স্থান
পপি খাতুন	বালুচর	সেরা
শিউলী আক্তার	রায়পুর- গৌরিপুর	সেরা
হাছিনা নার্গিস	আড়াইহাজার	সেরা
অনিতা রানী সরকার	চারিগ্রাম	ভালো
জাহানারা আক্তার	মনোহরগঞ্জ	ভালো
মোসা. কিসমোতারা খাতুন	শিবগঞ্জ	ভালো
রুবিনা আক্তার	বিটঘর	ভালো
মোসা. হাবিবা আক্তার	মাধাইয়া	ভালো
সুমি আক্তার	রাজাপুর	ভালো
সাদিয়া সুলতানা	আশুলিয়া	ভালো
মনি আক্তার	নওপাড়া	ভালো
রহিমা আক্তার	দাগনভূঞা	ভালো
সানজিদা আহাম্মেদ উর্মি	বজরা	ভালো

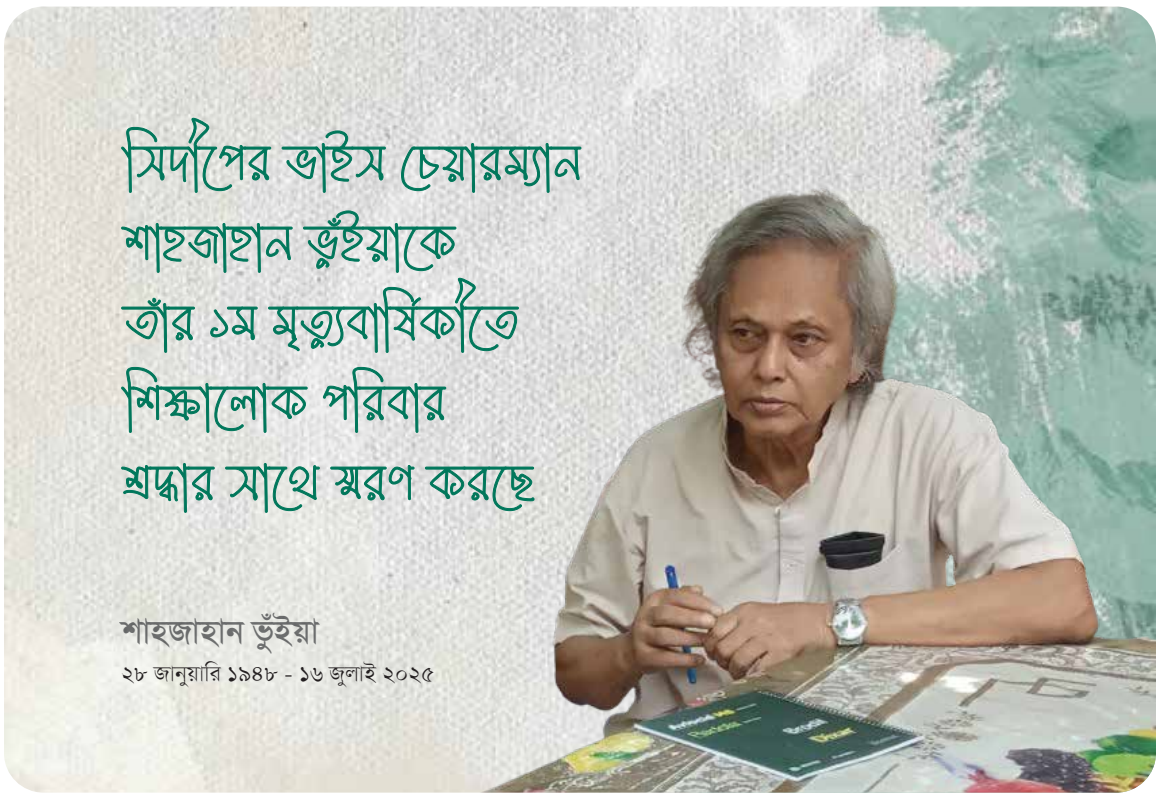

মোহাম্মদ শামছুজ্জামান-এর উপন্যাস ‘নিষুপ্ত জাগরণ’-এর প্রেক্ষাপট ও সমকালীন মূল্যায়ন শীর্ষক আলোচনা সভা

ছোটকাগজ ‘বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি’র উদ্যোগে ২০ জুন ২০২৬ শনিবার বিকালে রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে লেখক মোহাম্মদ শামছুজ্জামান রচিত জীবনধর্মী উপন্যাস ‘নিষুপ্ত জাগরণ’-এর প্রেক্ষাপট ও সমকালীন মূল্যায়ন শীর্ষক একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপন্যাসটি মুসলিম সাহিত্য সমাজের ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলনের প্রধান সংগঠক আবুল হুসেন-এর জীবন ও আদর্শের ওপর ভিত্তি করে রচিত।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমির সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কবি মাহফুজ সালাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, “কোন জাতির উন্নতির জন্য রাষ্ট্রকে সার্বজনীন করতে হয়। নানা জাতি গোষ্ঠী নিয়েই রাষ্ট্র হবে। সমাজে ধনী-গরিব আছে, এটা থাকবে তবে এটা কমিয়ে আনার আয়োজন দরকার। সমাজে অন্যায় অবিচার থাকে, তবে ন্যায় চর্চা করতে হবে।”

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত আলোচকগণ উপন্যাসের সাহিত্যমান, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সমকালীন সমাজে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির পরিচিতি তুলে ধরেন ‘বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি’র নির্বাহী সম্পাদক নাজনীন সাথী, লেখক ও আবুল হুসেনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন কবি অনার্য নাঈম। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন কবি ও সম্পাদক সৈকত হাবিব, কথাশিল্পী মনি হায়দার, লেখক ও শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ পাভেল চৌধুরী, কবি ও সাংবাদিক ইমরান মাহফুজ, কবি ও চিত্রশিল্পী শিশির মল্লিক, ‘বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি’র সম্পাদক আলমগীর খান এবং সাহিত্যকর্মী তানজুম সাকিব।

সভাপতির বক্তব্যে মাহফুজ সালাম বলেন, “বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পত্রিকা সব সময়ই মুক্তচিন্তা ও মননশীল সাহিত্যচর্চা করে আসছে।” অনুষ্ঠানে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি, সাহিত্যিক, গবেষক এবং প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রাবন্ধিক, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জনাব রিয়াজ মাহমুদ।

সাক্ষাৎকার

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক

২০২৫ সালের অক্টোবরে নৈতিক দর্শনের ছোট কাগজ 'নী'-এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রিয়াজ মাহমুদ ও নাজনীন সাথী

প্র। আমাদের সংস্কৃতিতে নৈতিকতার চর্চাটা কেমন?

উ। আমাদের দেশে যারা গণতন্ত্রী তাদের মধ্যে নৈতিক প্রশ্নে কোন আলোচনা সমালোচনা দেখিনি। তারা ধরেই নিতেন আমরা বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা বলবো। একজন-দু'জন ধর্মকে আক্রমণ করেও কথা বলতেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী থেকে শেখ মুজিব ধর্ম সম্পর্কে সতর্ক হয়ে কথা বলতেন। আঘাত দিয়ে বলতেন না। ভিতরে কিছু লোক ছিলো যারা বলতেন। যেটা শতকরা ১০০ ভাগ না। পাকিস্তান কালে আমাদের দেশে যারা ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলতেন শেরে বাংলা তাদের দলের। তারা বলতেন আমরা ধর্ম নিয়ে কথা বলবো না। আমরা আমাদের মত রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে জনগণের মন জয় করবো। ধর্ম যারা পালন করবেন তারা করবেন। যার পালন করবেন না তারা করবেন না। কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে যাতে বিবাদ না হয়– এটা আমাদের মূল লক্ষ্য। আমরা চাই সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ। যেটা মানুষের চেষ্টায় মানুষ করতে পারে। প্রকৃতিতে নানা বৈষম্য আছে। সেগুলো দূর করা যাবে না। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের উদ্ভাবন আসলে ও সেগুলো মানুষের ব্যবহারিক জীবনে গেলে তখন পারা যাবে। এখন আমরা গণতন্ত্র চাই। গণতন্ত্র মানে জনগণের শাসন ব্যবস্থা। মানুষ তো সবাই সমান নয়। কিন্তু আইনকানুন দিয়েও ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলো আমরা বন্ধ করবো। সব মানুষের সমান সুযোগ রাখবো। এই রকম কথা ছিলো। এ কথাগুলো তো সবাই সুন্দরভাবে বলতে পারেন না। বিশেষ করে যারা বামপন্থী ছিলেন তাদের ভিতর থেকে কেউ কেউ উল্টাপাল্টা কথা বলে ধর্মীয় শক্তিকে আঘাত করেছেন। ফলে বামপন্থীরা উঠতেই পারে নাই। ধর্মের যে নৈতিক সিদ্ধান্ত, মানুষ এগুলোতে আকৃষ্ট। দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের কাছে এটা আশ্রয়ের অবলম্বন। মানুষ বিপদে পড়লে বড় শক্তির কাছে আশ্রয় চায়। বাস্তবে তেমন বড় শক্তির অস্তিত্ব আছে কি? নেই। মানুষের আশ্রয়ের জায়গাতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব। এ কথাটা প্রথমে রাজা রামমোহন রায় তার একটা ছোট্ট পুস্তিকায় বলেছেন।

রামমোহন রায় হিন্দু কমিউনিটিকে সামনে এনেছেন। মুসলমানদের বিরোধী কোন কথা তিনি বলেননি। সবাই যখন ধর্মীয় অন্ধকার সময়ে আছেন, তখন একজন রামমোহন রায় আত্মপ্রকাশ করলেন। যিনি ইউরোপিয় সভ্যতা সম্পর্কে যতটুকু পারা যায় জ্ঞান অর্জন করেছেন। ইংরেজি ভাষাও শিখেছেন। সর্বসাধারণের কল্যাণ করতে হবে। শুধুমাত্র ধনীদের কল্যাণ না। এইসব অনেক উন্নত চিন্তা। রামমোহন সেটা করেছিলেন। ফলে হিন্দুসমাজ একভাবে এগিয়েছে ধর্মীয় যে বদ্ধতা ছিলো সেগুলো থেকে। রামমোহন শুরু করেছেন। তার পরবর্তীতে হিন্দুসমাজ যেভাবে এগিয়েছে, মুসলমানরা সেভাবে পারেনি। কারণ মুসলমানরা অনেকে বৌদ্ধ ধর্ম এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের থেকে মুসলমান হয়েছে। আরব থেকে এসেছে এমন লোকের সংখ্যা তো কম। এরকম বাস্তবতার মধ্যে নৈতিক প্রশ্ন ডেমোক্র্যাট এবং স্যোশালিস্টদের মধ্যে আসে নাই। আমরা যদি সোভিয়েত বা চীনের দিকে দেখি– বিপ্লবের পরে লেনিন বা মাও ধর্মীয় লোকদের নিয়ে কোন কথা বলেননি। চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন প্রদেশে ধর্মীয় ধারার লোকদের যুক্ত করতে। এবং পার্টি কর্মীদের বলতেন এমন কোন কথাই আপনারা বলবেন না যাতে মানুষের ধর্মবোধে আঘাত লাগে। মাও এই লাইন ধরেই এগিয়েছেন। চীনে তো ছিলো ব্যাপকভাবে বৌদ্ধ ধর্ম। কিন্তু সেখানেও ধর্মকে আঘাত না করেই পার্টি এগিয়েছে। মানুষ কি করলে ভালো হবে ও কি করলে খারাপ হবে, এইসবের নির্দেশ প্রত্যেকটা ধর্মের মধ্যে আছে। এই বিষয়গুলোই নৈতিক সিদ্ধান্ত বা নীতি।

নৈতিকতা নিয়ে পত্রপত্রিকাতে লেখায় আমার অনেক পরিচিতজনও আমাকে বলতেন, এটা নিয়ে আপনি কেন লিখছেন, এটা তো মোল্লা-মৌলভীদের ব্যাপার। আমি বলেছি, না– এটা কমিউনিস্টদেরও ব্যাপার, বামপন্থীদেরও ব্যাপার।

প্র। নৈতিকতার চিরায়ত আধুনিক রূপ আছে?

উ। মানুষের পোশাক পরিচ্ছদের মত করে নৈতিকতার পরিবর্তন ঘটে না। নৈতিকতা ধর্মীয়ভাবে এলেও এগুলো দীর্ঘস্থায়ী। নৈতিক বিবেচনা এবং অর্থনৈতিক বিবেচনাকে এক সাথে ভাবতে হবে। সাইকেলেজিস্টরা মন নিয়ে কি বলেন। পারিপার্শ্বিকতা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে মানুষের মস্তিষ্কে যায়। এর মধ্য দিয়ে সে বিচার বিবেচনা করে। দুনিয়া বদলাচ্ছে। প্রকৃতি বদলাচ্ছে। মানুষের অভিজ্ঞতা বদলাচ্ছে। এর মধ্যে পরিবর্তনশীলতা দরকার। পরিবর্তনশীলতা প্রকৃতির নিয়মনীতির মধ্য দিয়ে করতে হবে। জরবদস্তি করে ভালো কিছু প্রতিষ্ঠা করা যায় না। মানুষের খাওয়াপরার পরই নৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন। নৈতিকতা একটা জীবনের ব্যাপার।

যে কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে নৈতিক পরিকল্পনাটা থাকা উচিত। প্রকৃতি বদলাচ্ছে, মানুষ বদলাচ্ছে। এমন অবস্থায় কোন নীতিই একইরকম থাকবে তা বলা যায় না। পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে আমাদের বদলাতে হবে। তবে এটা পোশাক-আশাক পাল্টানোর মত দ্রুত পাল্টাবে না...

প্র। নৈতিকতা ও সমাজবাস্তবতার সাথে সম্পর্ক কী?

উ। নৈতিক প্রশ্নটা দু রকম হতে পারে। এক, সবার মঙ্গল চিন্তা করা। দুই, উচ্চ শ্রেণীর জন্য যা ভালো হবে। এটা ভাওতামূলক তফাৎ। এখনো বাংলাদেশে যে পাঠ্যপুস্তক সেখানে ধর্মীয় চিন্তার বাহিরে নৈতিকতার কথা কেউ বলেন না। এই দেশে যারা গণতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রী তারা এ বিষয়ে বেশি উদাসীন। স্কুলে ইসলাম ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, খিষ্ট্রান ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি বই আছে। খ্রিস্টান জনসংখ্যা এখানে কম। তবু এদের সবার নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক আছে। যারা গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী তারা এই বিষয়গুলো নিয়ে উদাসীন। গণতন্ত্রী ও নৈতিক শিক্ষা– এমন বই কেন নাই? তাদের কি নৈতিক শিক্ষার দরকার নাই?

প্র। সৎ আচরণ বলতে আমরা কী বুঝি, এর চিরায়ত অবয়ব আছে?

উ। সদাচারণ দেশকালের মধ্যে। বাঙ্গালীদের সদাচারণ এক রকম, হিন্দুদের আরেক রকম, বিদেশীদের আরেক রকম– তা হলেও ভিতরে মিল আছে। এগুলো আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে।

প্র। গৌতম বুদ্ধ, সক্রেটিস, প্লেটো প্রমুখ নৈতিক প্রশ্নটিতে ব্যক্তির প্রজ্ঞা ও উপলব্ধির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা মনে করতেন আত্মমুক্তিতেই মানুষের পরম সিদ্ধি। কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উ। সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের বক্তব্য বিবেচনায় নেওয়ার গুরুত্ব আছে। কিন্তু কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সে সময়ে কী কী প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তার তালিকা করে এ সময়ের সাথে মিলিয়ে দেখা উচিত। আমরা হঠাৎ করেই

আগাচ্ছি না। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তা নিয়ে ধাপে ধাপে আগাচ্ছি। এর সাথে ক্ষমতায় যারা থাকে তাদের একটা প্রভাব থাকে। যদি প্রগতিশীল শক্তি ক্ষমতায় থাকে তার প্রভাব একরকম। প্রতিক্রিয়াশীল থাকলে তার প্রভাব আরেক রকম। আমরা নৈতিকতার প্রশ্নে যে সিদ্ধান্ত নিতে চাই তাতে যেন সর্বজনীন কল্যাণ থাকে। কেবল উচ্চ শ্রেণীর কল্যাণ নয়। আমাদের চেষ্টা থাকবে প্রকৃতিসৃষ্ট সবকিছু বিবেচনায় রাখা। বৈজ্ঞানিকভাবে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আজকের দিনে কি করলে আমাদের কল্যাণ হবে সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কয়েকদিন ধরে যে মবোক্রেসি চলছে তার দ্বারা উন্নতির দিকে যাওয়া যায় না। প্রগতির দিকে যাওয়া যায় না। প্রগতিতে যেতে হলে সংগঠিত মানুষ দরকার, যে মানুষ সঠিক নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত।

প্র। সমাজ, সভ্যতার ও ইতিহাসের যে পরিণতি, কার্ল মার্কস যাকে শ্রেণী দ্বন্দ্বের পরিণতি হিসবে দেখেছেন এবং তা থেকে একটি উন্নত সমাজব্যবস্থার রূপরেখা তিনি টানতে চেয়েছেন– তার এই দৃষ্টিভঙ্গি আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উ। মার্কস-এঙ্গেলসের উত্তরসূরী যারা যেমন লেনিন, স্টালিন প্রমুখ মানুষের মনের দিকটাতে গুরুত্ব দেননি। মনের দিকটা যে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো তারা দেখেননি। মাও কিছুটা দেখেছেন। শুধু আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হলেই সব পরিবর্তন হয়ে যাবে এ ধারণাটা অপর্যাপ্ত। মানুষের মনের দিক ও নৈতিক দিকটার বিষয়ে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি থাকার দরকার ছিলো। ডিক্টেটরশিপ অব প্রলেতারিয়েত সোভিয়েত ইউনিয়নে খুব একটা কাজ করেনি। চীনের মাও সেতুং এটা ধরে রাখতে পারেননি। ন্যায়-অন্যায় বিবেচনার দিক মাওয়ের দৃষ্টি ছিলো। কিন্তু তা পর্যাপ্ত না।

গর্বাচেভের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যিনি ছিলেন তিনি গর্বাচেভের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেছিলেন। দীর্ঘদিন থেকে তাদের লক্ষ্য ছিলো এটা ভেঙ্গে দেওয়ার। গর্বাচেভকে বলা হয়েছে– সোভিয়েত ভেঙ্গে দিয়ে দেখেন, সারা দুনিয়া আপনাকে সেলিব্রেট করবে। এইসব প্ররোচণায় গর্বাচেভ তার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে তাদের ১৪টা রাষ্ট্রকে স্বাধীনতা দিলো। রাশিয়াও তার সমাজতান্ত্রিক নীতি পরিবর্তন করলো। রাশিয়ার জনগণ ভাবছে, এটা তাদের নেতৃত্বের দুর্বলতা।

বছর দেড়েক আগে গর্বাচেভ মারা গেছেন। সে উপলক্ষ্যে কেউ কেউ পুতিনকে বলেছেন তার অন্তষ্টিক্রিয়ায় যেতে। পুতিন বলেছেন, তিনি তো রাশিয়ার জনগণের ক্ষতি করে গেছেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে সহায়তা করেছেন। তিনি পশ্চিমাদের অনেক বাহবা পেয়েছিলেন। কিন্তু জনগণের তো কোন উন্নতি হয়নি। এসব কথাগুলো

বাংলা-ইংরেজি পত্রপত্রিকায় এসেছে। কিন্তু কেন এটা ভেঙ্গেছে তার ইতিহাস নিয়ে খুব ভালো কাজ হয়নি।

প্র। বিগত সময়ে যে বিপর্যয়গুলো ঘটেছে তার জন্য কি নৈতিকতাই দায়ী?

উ। নৈতিকতাই দায়ী কিন্তু তার বৈষয়িক দিকও রয়েছে। যে কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে নৈতিক পরিকল্পনাটা থাকা উচিত। প্রকৃতি বদলাচ্ছে, মানুষ বদলাচ্ছে। এমন অবস্থায় কোন নীতিই একইরকম থাকবে তা বলা যায় না। পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে আমাদের বদলাতে হবে। তবে এটা পোশাক-আশাক পাল্টানোর মত দ্রুত পাল্টাবে না। সোভিয়েত যে ভেঙ্গে গেলো তাও নৈতিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। লেনিন ও তার অনুসারীরা বিষয়টিতে মনযোগ দেননি। ইউরোপ ও আমেরিকা প্রথমে ভেবেছে এটা বেশিদিন টিকবে না। কিন্তু যখন তা দশ বছর টিকে গেলো তখন তারা চিন্তিত হলো। অবশেষে গর্বাচেভ তা ভেঙ্গে দিলো। ফলে তা পরিবর্তন হয়ে গেলো।

প্র। এসব পরিবর্তন বৃহদর্থে কোন দিকে?

উ। এই বিষয়গুলে পূর্বে মার্কসবাদীরা যেভাবে দেখেছেন সেভাবে এখন বেশি দূর দেখা যাবে না। বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত করে দেখতে হবে। মার্কসবাদকে ধর্মের মত করে দেখা যাবে না। পরিবর্তনের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। রাষ্ট্র গঠিত হয়, তার পুনর্গঠন দরকার হয়। রাষ্ট্র বাতিল করে দিয়ে নতুন করে গড়তে হয়। গত তিন হাজার বছরের মানুষের কর্মকাণ্ড দেখলে বুঝা যায় সভ্যতা গড়ে ওঠে এবং একটা সময় এটা অচল অবস্থা তৈরি হয়। তখন নতুন সভ্যতা গড়তে হয়ে। এ অবস্থায় যেসব জাতি তাদের আইনকানুন পরিবর্তন করে তারা বাঁচতে পারে। আর যেসব জাতি অন্ধ বিশ্বাসরূপে অপরিবর্তনীয় অবস্থান নেয় তারা আর চলতে পারে না।

স্মৃতিতে অম্লান অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক

৮ম শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলনে

ফাতিহুল কাদির সম্রাট, অধ্যাপক ও লেখক

শিরিন হোসেন, উন্নয়নকর্মী

আবদুল হালিম খান, মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজকর্মী

হাফিজুল ইসলাম, উন্নয়নকর্মী

রুমানা সুলতানা, উন্নয়নকর্মী

Shikkhalok
(a CDIP education bulletin)
13th year 2nd issue, May-July 2026

গৃহিণীদের আস্থা
BLOOM গুঁড়া মশলা
ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ
০১৩১৩০৩০৭৮১
ceo@cdipenterprise.com, sales@cdipenterprise.com